বন্ধুর জীবন

অনিন্দ্য শুভ

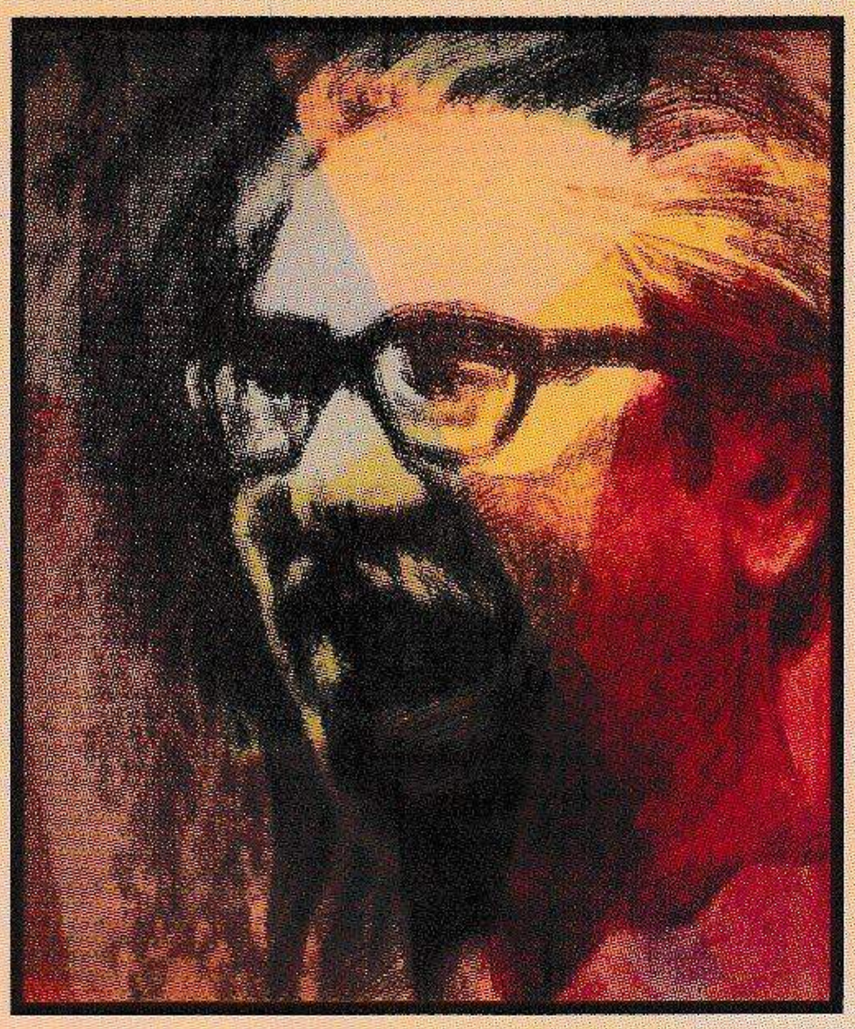

প্রচ্ছদ : সোহেল আনাম

বঙ্গবন্ধুর কিশোর জীবন

বঙ্গবন্ধুর কিশোর জীবন

অনিন্দ্য শুভ্র

ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

প্রকাশনার একযুগ পেরিয়ে

বঙ্গবন্ধুর কিশোর জীবন
অনিন্দ্য শুভ্র

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০১৭

প্রকাশক
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৪৭৬০, ০১৭১৫ ৪২৮২১০, ০১৭১২ ২৩৫৩৪২
e-mail : ittadisutrapat@yahoo.com
web : www.ittadigranthoprokash.com

পরিবেশক
যুক্তরাষ্ট্র : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক
যুক্তরাজ্য : সঙ্গীতা, ২২ ব্রিক লেন, পূর্ব লন্ডন

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/ittadi

প্রচ্ছদ
সোহেল আনাম

অক্ষরায়ন
বন্ধু কম্পিউটার্স
২৮/সি-২ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

ছাপাখানা
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি কে দাশ রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

মূল্য
১৫০ টাকা

ISBN: 978 984 904 618 9

উৎসর্গ

সবসময় হাসিমুখ তাঁর। সদা উচ্ছল।
মাতিয়ে রাখেন চারপাশ।
প্রিয় মানুষ উত্তম কুমার ধর।

ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার এক গ্রাম। গ্রামের নাম টুঙ্গিপাড়া। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। মঙ্গলবার। শেখ লুৎফর রহমানের বাড়িতে খুশির জোয়ার। ভীষণ খুশি দুই বোন—ফাতেমা বেগম ও আছিয়া বেগম। তাদের একটা ভাই হয়েছে। মা সায়রা খাতুনও খুশি।

পাড়াপড়শি আর আত্মীয়পরিজনেরা ছুটে এলেন। তবে ওই বাড়ির মানুষদের একটা মজা আছে। পাড়া-পড়শিরাই তাদের আত্মীয়স্বজন। পাশেই নানার বাড়ি। দাদাবাড়ি থেকে নানাবাড়ি মাত্র দুই হাত দূরে। এমন মজার নানাবাড়ি-দাদাবাড়ি কারো আছে?

খবর পেয়ে ছুটে এলেন নানা। গ্রামের সবাইকে মিষ্টি খাওয়ালেন। কদিন পরে আকিকাও হয়ে গেল ছেলের। আকিকার সময় নানা নাম রাখলেন—মুজিবুর রহমান। আর বংশ যেহেতু শেখ, এবং শেখ নামের প্রথমেই বসে। সে কারণে তাঁর নাম হয়ে গেল শেখ মুজিবুর রহমান। নাম রেখে অবশ্য নানা তাঁর মাকে বলেছিলেন, 'মা সায়রা, তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম যে নাম জগৎজোড়া খ্যাত হবে।'

আব্বা আর আম্মা কিন্তু খোকা বলেই ডাকতেন। তখনকার দিনে বড় ছেলেকে আদর করে খোকা বলেই ডাকতেন বাবা-মা। সেই থেকে তিনি হয়ে গেলেন খোকা।

এরপর খোকার আরো দুই বোন ও এক ভাই হয়। ছোট ভাইবোনরা তাঁকে ডাকত মিয়াভাই বলে। পাড়াপড়শিদের মধ্যে যারা ছোট, তারাও মিয়াভাই বলে ডাকত। তবে স্কুল আর কলেজে তাঁকে সবাই ডাকত মুজিব ভাই বলে। স্কুল-কলেজে পড়ার সময় বয়সে সবার চেয়ে বড় ছিলেন। কীভাবে বয়সে সবার চেয়ে বড় হলেন? সেটাও একটা গল্প।

খোকার বাবা শেখ লুৎফর রহমান থাকেন গোপালগঞ্জ শহরে। আদালতের সেরেস্তাদার। সপ্তাহ শেষে গ্রামে আসেন। আর বাবা গ্রামে এলেই হলো। বাবার সঙ্গে ছায়ার মতো লেপ্টে থাকেন খোকা।

বাবা আসার দিনটা ছিল খোকার ভীষণ প্রিয়। বিকেল হলেই চলে যেতেন বাড়ির নৌকা ভেড়ার ঘাটে। খোকা জানতেন, গোপালগঞ্জ থেকে বাবা রওনা দেন দুপুরে। নৌকায় করে টুঙ্গিপাড়া আসতে আসতে সন্ধে। দূর থেকে খোকা বুঝতে পারতেন কোন নৌকাটায় বাবা আছেন। ঘাটে নৌকা না ভেড়া পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। নৌকা থেকে বাবা নামলে বাবার হাত ধরতেন। গল্প করতে করতে বাড়ির পথ ধরতেন। বাবার হাতে থাকত খোকার প্রিয় নানান জিনিসপত্র। কখনো খাবার, কখনো অন্যকিছু।

বাবার কাছে এটা ওটা জানতে চাইতেন। বেশ কৌতূহল ছিল খোকার। বাবাও খোকার প্রশ্নের জবাব দিতেন। কখনো বিরক্ত হতেন না। বাড়িতে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে ভাত খেতে বসতেন বাবা। চট করে বাবার কোলে উঠে বসতেন খোকা। নিজে খাওয়ার আগে খোকার মুখে এক লোকমা ভাত তুলে দিতেন বাবা। বাবার হাতে দু-চার লোকমা ভাত খেয়ে উঠে যেত খোকা। তারপর বাবার পাশে গা ঘেঁষে বসতেন। বোনেরাও বাবার চারপাশে ঘুর ঘুর করত। আর খোকার দিকে তাকাত। তখন কিন্তু বোনদের ছিল বড্ড শান্তির সময়। কারণ প্রতিদিন ওই সময় বোনদের সঙ্গে এটা ওটা দুষ্টুমি আর খুনসুটি করেই যেতেন খোকা। নয়তো মায়ের কাছে কাছে থাকতেন। বাবাকে পেলে মায়ের কাছেও যান না। সারাটা সন্ধে বাবার কাছে কাছেই থাকেন। রাতের খাবার শেষেও বাবার কাছছাড়া হন না। এখনও যে বাবার কাছ থেকে অনেক কিছু জানার বাকি আছে।

রাতে বাবার গলা ধরে বিছানায় শুয়ে থাকেন খোকা। শহরের গল্প বলা শুরু করতেন বাবা।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর সবাইকে নিয়ে কুরআন তেলাওয়াতে বসেন বাবা। কুরআন তেলাওয়াত শেষ হতেই বাইরে ছুটে যান খোকা। সকালের প্রকৃতির সঙ্গে তার ভীষণ মিতালি। উঠোনের বরই গাছটায় একঝাঁক চড়ুই। মা তখন রান্নাঘরে। কচু আর লতা-পাতার জংলার মাঝ দিয়ে দৌড়ে চলে আসেন সাঁকোর কাছে।

সাঁকোর ওপারে নদীর ধারে অনেক জেলে। মাছের ঝাঁকা নিয়ে বসে থাকে। নানা রকম মাছ—ইলিশ, শরপুঁটি, কই, মাগুর, কাতলা, রুই, চিংড়ি। সদ্য তোলা সবজির ঝাঁকা নিয়ে বসেছে সবজিওয়ালারা—পটল,

বেগুন, ঝিঙে, কাঁচা মরিচ, আলু। গোয়ালারাও এসেছে সদ্য দোয়ানো দুধ নিয়ে। কয়েকজন মহাজনের গলাও শোনা গেল। এখান থেকে মাছ কিনে লঞ্চে করে গোয়ালন্দ পাঠাবে মহাজনরা। সেখান থেকে যাবে খুলনা কিংবা কলকাতা। বেশ হট্টগোল তখন নদীর পারে। কিছুক্ষণ হট্টগোল দেখে আবার ছুট দেন খোকা। এবার এক ছুটে কলাবাগান। তারপর মধুমতি নদীর পাশ দিয়ে চলে আসেন বড় দিঘির কাছে।

আরে! ওই তো একটা মাছরাঙা। দিঘিরপাড়ে পুঁতে রাখা বাঁশের ডগার উপর বসে আছে।

কয়েকদিন ধরে মাছরাঙাটাকে এখানেই বসে থাকতে দেখেন খোকা। যখনই আসেন দেখেন মাছরাঙাটা ওখানে বসে তাকিয়ে আছে পানির দিকে। চুপটি করে। শরীরের উপরের দিকটা নীল আর সবুজে মেশানো। নিচে চটা রং। গলায় সাদা রঙের ছোপ। এত সুন্দর পাখি! মাছরাঙার সৌন্দর্যে মন ভরে যায় খোকার। ওদিকে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায় একদল সাদা বক। ধবধবে সাদা। মনে হয় যেন সাদা মেঘ। ছোট ছোট মেঘ।

হঠাৎ ঝাঁ করে পানিতে নেমে গেল মাছরাঙা। খোকার চোখ এড়ায় না। খানিক বাদে ঠোঁটে একটা মাছ নিয়ে উঠে আসে। আবার বসল গিয়ে সেই বাঁশের খুঁটিতে। মনে হয় মাছটাকে যুৎসইভাবে ঠোঁটবন্দি করতে পারেনি। ঠোঁটের মধ্যেই মাছটাকে নেড়েচেড়ে ঠিক করে নিল। তারপর সাঁই করে উড়াল দিল।

খোকার গায়ে হাফহাতার গেঞ্জি। নদী থেকে আসছে ভেজা ভেজা বাতাস। এই বসন্তেও খোকার গা শিরশির করে। নাহ। এখানে আর নয়। আবার ছুট দেন খোকা। এবার এক ছুটে বাড়িতে।

বাড়িতে ফিরে খোকা দেখলেন তখনও মা রান্নাঘরে। রান্না নিয়ে ব্যস্ত। খোকাকে দেখেই একটা জলচৌকি পেতে দেন মা। বড় একটা থালায় খোকাকে খেতে দেন। ঢেকিছাঁটা লাল চিড়ে ভেজানো, কোরানো নারকেল, চাঁপাকলা। সঙ্গে সরভাসা ঘন একবাটি দুধ আর খেজুরের গুড়। আরেকটা বাটিতে মাখন। চাঁপাকলা দিয়ে ভেজানো চিড়ে আর নারকেল খেতে থাকেন খোকা। খাবার শেষে গুড়মাখানো দুধটুকুও সাবাড় করে ফেলেন। মা এবার মাখনের সঙ্গে খানিকটা চিনি মিশিয়ে নিজেই খাইয়ে দিলেন।

সামনে থাকলে মা নিজেই খোকাকে খাইয়ে দেন। খোকাকে খাওয়াতে খুব ভালো লাগে তাঁর। তাছাড়া খেতে বসলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে খায় খোকা। একে দেয়, ওকে দেয়।

সকালের খাওয়া শেষ। এবার বই-স্লেট নিয়ে কাচারি ঘরে ছোটেন খোকা। নতুন এক মাস্টার সাহেব এসেছেন নোয়াখালী থেকে। পণ্ডিত শাখাওয়াত উল্লাহ। বাংলা আর গণিত শেখান। শেখবাড়ির ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে পড়ে। বর্ণমালার ছড়া পড়ে, নামতা পড়ে। সুরে সুরে।

পড়া শেষ। এবার গল্প শোনার পালা। পণ্ডিতজি অনেক রকম গল্প জানেন। দেশের গল্প, নবীজির গল্প, চার খলিফার গল্প, গৌতমবুদ্ধের গল্প। রাম-রাবণের যুদ্ধের গল্প। ওসব গল্প কেবল শুনতেই ইচ্ছে করে। কিন্তু অনেক সময় ধরে গল্প বলেন না পণ্ডিতজি। অল্প সময়ে ছোট ছোট গল্প বলেন। যাতে সব গল্প মনে থাকে। যাতে ওসব গল্প থেকে নিজের মতো করে ভাবতে পারে সবাই—সে সুযোগটুকুও রাখেন। অনেক সময় পড়তে ইচ্ছে করে না অনেকের। কিন্তু গল্পের লোভে ঠিকই পণ্ডিতজির কাছে হাজির হয়ে যায়। শিশুদের কাছে টানার, পড়ায় মনোযোগী করার এমন অদ্ভুত গুণ তাঁর।

পড়া শেষ, গল্প শোনাও শেষ। বেলাও গড়িয়েছে অনেকখানি। এবার ছুটি। ছুটির পর হইচই করতে করতে সবাই ছোটে বাড়িতে। বই-স্লেট ঘরে রেখেই আবার ছুট। কোমরে গামছা পেঁচিয়ে ছুট দেয় খালের দিকে। কার

আগে কে খালের পানিতে ঝাঁপ দেবে—শুরু হয় প্রতিযোগিতা। শুধু পানিতে ঝাঁপ দেয়া নয়, শাপলা তোলা, মাছধরা, সাঁতরে অনেক দূরে যাওয়া—আরো কত কী!

টুঙ্গিপাড়ার পাশের গ্রামের নাম গিমাডাঙ্গা। ওই গিমাডাঙ্গায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন খোকার ছোট দাদা খান সাহেব শেখ আবদুর রশিদ। ওই এলাকায় এটাই ছিল একমাত্র ইংরেজি স্কুল। খোকাদের বাড়ি থেকে সোয়া মাইল দূরে স্কুলটি। ১৯২৭ সালে সাত বছর বয়সে ওই স্কুলে ভর্তি হন খোকা।

সকাল থেকে স্কুলে যাওয়ার তাড়া থাকে সবার মধ্যে। খোকা কিন্তু খালের পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করে বেড়ান প্রতিদিন। বাড়ি থেকে খবর পাঠাতেন মা। দূত এসে খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে সমানে চেঁচিয়ে যেত, 'ও মিয়া ভাই, স্কুলে যাওয়ার সময় হয়েছে। আপনার মা ডাকছেন।'

সে-কথা শোনার সময় কোথায় খোকার? তখন দূর সাঁতারের একটা প্রতিযোগিতা চলছিল। সেটা শেষ না করে খোকা উঠবেন পানি থেকে? ওদিকে স্কুলের সময় যে পেরিয়ে যায়! বাড়িতে গিয়ে আবার খেতে হবে। তারপর স্কুল। তবে স্কুল কিন্তু বেশ ভালো লাগে খোকার। অনেক মজা হয়। বন্ধুদের সঙ্গে স্কুলের মাঠে ছুটোছুটি—সেটাও খুব ভালো লাগে।

ঝটপট পানি থেকে উঠে যান খোকা। তারপর ছুট দেন বাড়ির দিকে। বাড়িতে ফিরেই দেখেন খাবার নিয়ে বসে আছেন মা।

ঢেঁকিছাঁটা লাল চালের ভাত। গরম ভাত থেকে তখনও ধোঁয়া উঠছে। বড় বোন এসে ভাতের উপর দু চামচ ঘি ছড়িয়ে দিতেন। মা লবণ দিয়ে ভাত মাখিয়ে দিতেন। তারপর বড়সড় একটা কই মাছ ভাজা দিতেন খোকার থালায়। ভাজা কই মাছ খোকার খুব প্রিয়। কিন্তু মাছের কাঁটা যে বাছতে জানে না।

খোকা খেতেন আর মা হাতপাখা এনে দিতেন বড় বোনের হাতে। বড় বোন হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতেন থালায়। যাতে তাড়াতাড়ি ভাত ঠাণ্ডা হয়। এই সুযোগে কইয়ের কাঁটা বেছে দিতেন মা। শিগগিরই ভাত খেয়ে উঠে যেতেন খোকা। তারপর ছুটতেন স্কুলে।

ছুটির পর দলবেঁধে স্কুল থেকে ফিরতেন খোকা। চলে যেতেন

পাটগাতি বাজারে। বাজারের পেছনে নদীর ধারে একটা বড়সড় জারুল গাছ ছিল। ওই জারুল তলায় এসে নদীতে পা ডুবিয়ে বসে থাকতেন। এভাবে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে দারুণ লাগে। বিশেষ করে চৈত্র মাসের গরমে। নদীর ঠাণ্ডা পানিতে এভাবে পা ডুবিয়ে বসে থাকলে পুরো শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

ঘাটে বাঁধা থাকত বেশ কিছু নৌকা। একটা নৌকার দিকে নজর আটকে গেল খোকার। ওর সমান বয়েসী এক শিশু। কুচকুচে কালো শরীর। কিন্তু পেটানো। ভাত খাচ্ছে নৌকায় বসে।

জানতে চাইলেন খোকা, 'তোমার তো অনেক মজা। নৌকায় বসেই খাচ্ছ!'

নৌকায় বসা ছেলেটি জবাব দিল, 'নৌকাই আমার বাড়ি। এখানে বসে খাব না তো, কোথায় খাব?'

ঠিক কথা। আবার জানতে চাইলেন খোকা, 'কী খাচ্ছ?'

'ভাত!'

'কী দিয়ে খাচ্ছ?'

মানুষ নিয়ে খোকার কৌতূহল সবসময়ই। কোন মানুষ কেমন, কোন মানুষের জীবন-যাপন কেমন—এসব তার জানা চাই। এই কৌতূহলটা ওর ভিতর থেকেই।

মনে হয় ছেলেটি খোকার কথা শুনতে পায়নি। খাওয়ার দিকেই ওর যত মনোযোগ। নিশ্চয়ই খুব মজার তরকারি দিয়ে ভাত খাচ্ছে!

আবার জানতে চাইলেন খোকা, 'কী দিয়ে ভাত খাচ্ছ?'

এবার মনে হলো বেশ অনিচ্ছায় জবাব দিল ছেলেটি, 'পিঁয়াজ দিয়ে।'

পিঁয়াজ দিয়ে! বেশ অবাক হলেন খোকা। শুধু পিঁয়াজ আর লবণ দিয়ে কেউ এত মজা করে ভাত খেতে পারে! নিশ্চয়ই অনেক মজা। নইলে খাচ্ছে কেন?

'খুব মজা, তাই না?'

গপগপ করে ভাত খাচ্ছিল ছেলেটি। এবার আর জবাব দিল না। ভাত খাওয়া শেষে ঢকঢক করে পানি খেল। মনে হলো পানি দিয়েই পেটের খালি জায়গাটা ভরে নিল।

নাহ্! ছেলেটিকে দেখে মনটা কেন যেন খারাপ হয়ে গেল খোকার।

স্কুলে আসার আগে বড় একটা কই মাছ দিয়ে ঘিমাখা ভাত খেয়ে এসেছেন। অথচ তাঁর বয়সী একটা ছেলে শুধু পিঁয়াজ দিয়ে ভাত খেল! সবাই একই রকম খেতে পায় না কেন?

ভাবতে গিয়ে মন আরো খারাপ হয়ে যায় খোকার। ওদিকে বন্ধুরা তখন ভূতের গল্প ফেঁদে বসেছে। একজন গল্প বলছে বাকিরা মন দিয়ে শুনছে। কিন্তু খোকার সেদিকে মন নেই। খোকা তাকিয়ে আছেন নদীর দিকে। দুপুর শেষের রোদ পড়ে নদীর পানি তখন ঝিকঝিক করছে। কাছে দূরে নানান নৌকা। ছোট নৌকা, বড় নৌকা। নৌকায় আবার নানার রঙের পাল। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ।

হঠাৎ বাঁশির শব্দে ঘোর ভাঙে খোকার। কী মিষ্টি। কে বাজায় এত সুন্দর করে? আশপাশে তাকান খোকা। আরে! সেই ছেলেটাই তো। একটু আগেই যে পিঁয়াজ দিয়ে ভাত খেয়েছিল পরম তৃপ্তি নিয়ে। ওর বাজানো বাঁশিতে এত সুন্দর সুর! আহা! মনটা ভরে গেল। বন্ধুরা তখনও গল্প-গুজব করছিল। খোকা ওদের থামিয়ে দিলেন। সবাইকে কান পেতে বাঁশির সুর শোনার ইশারা করলেন। সবাই গল্প থামিয়ে কান পাতে। শান্ত নদীর পাড়ে বসে বাঁশির সুর! কী দারুণ! এমন সুন্দর বাঁশি বাজানো কেউ কি ওকে শিখিয়েছে? ছেলেটার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে দমাতে পারলেন না খোকা। হঠাৎ থেমে যায় বাঁশির সুর।

নৌকার পাটাতনের নিচে বেশ পানি জমে গিয়েছে। সেঁচতে হবে। একটা নারকেলের মালা নিয়ে পানি সেঁচতে শুরু করে ছেলেটি। দলবল নিয়ে খোকা চলে যান ছেলেটির নৌকার কাছে।

‘কী নাম তোমার?’

‘গৌতম।’

গৌতম! চমকে ওঠেন খোকা। মনে পড়ে যায় ইতিহাসের গল্প। পণ্ডিতজি বলেছিলেন গৌতমের গল্প। গৌতম মানে গৌতমবুদ্ধ। প্রথমে ছিলেন রাজা। পরে রাজ্যপাট ত্যাগ করে হয়ে যান সন্ন্যাসী।

‘বাড়ি কোথায়?’

‘চিংগাড়ি।’

‘বাঁশি বাজানো শিখেছ কার কাছে?’

‘কারো কাছে না। নিজে নিজে।’

নিজে নিজে! অবাক হন খোকা। নিজে নিজে এত সুন্দর বাঁশি বাজানো শিখল কেমন করে? তার মানে কেউ যেটা ইচ্ছে করে, সেটা সে শিখতে পারে। ইচ্ছেশক্তি থাকলেই হলো।

এবার নিজে থেকেই কথা বলতে লাগল গৌতম, 'বাঁশিটা ছিল বাবার। এখন আর বাবা বাজায় না। আমিই বাজাই।'

হঠাৎ খোকার হাত ধরে টান দেয় একজন, 'মিয়াভাই, অনেক বেলা হয়ে গেছে। বাড়িতে চলো। দেরি হয়ে যাচ্ছে তো!'

আরে তাই তো! খোকার যেন সম্বিত ফেরে। মা তো চিন্তা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে দলবল নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল খোকা।

পাটাতনের সবটুকু পানি সেঁচে নিয়েছে গৌতম। পানি সেঁচা শেষ করেই আবার বাঁশিটা বের করে। তারপর আবার সুর তোলে।

বাড়ির আশপাশে নানান ফলের গাছ। বড়ই, পেয়ারা, জাম্বুরা। বড় দুই বোন চেয়ে থাকেন খোকার মুখের দিকে। বোনদের অনুরোধে পেড়ে দিতেন। খোকার মতো গেছো আর দ্বিতীয়টি নেই। কোন পাখি কোন গাছে বাসা বেঁধেছে। কয়টা ডিম পেড়েছে। কবে ছানা ফুটবে। সব খোকার জানা। গাছে উঠে পাখিদের খবর রাখতেন নিয়মিত। সুযোগ বুঝে ধরে ফেলতেন শালিক বা ময়নাছানা। তারপর পুষতেন। কথা বলানো শেখানোর চেষ্টা করতেন। একটা পোষা কুকুর ছিল তাঁর। নাম ভুলু। বাড়িতে এলেই তাঁর কাছে দৌড়ে আসত ভুলু। তাঁর চারপাশে ঘুরঘুর করত। আর আসত একটা বানর। বানরটাও ছিল তাঁর পোষা। থাকত গোয়াল ঘরের চালে। তাঁর শব্দ পেলেই ছুটে আসত কাছে। খোসা ছাড়িয়ে বানরকে কলা খাওয়াতেন খোকা।

বর্ষায় বাড়ির পাশের খালটা হয়ে যেত নদীর মতো চওড়া। আশপাশে কেবল পানি আর পানি। তখন নৌকায় করে স্কুলে যেতেন খোকা। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় এক বর্ষায় ঘটল দুর্ঘটনা।

সকাল থেকেই সেদিন আকাশ ছিল অন্ধকার। ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছে। মেঘও ডাকছে—গুড় গুড়, গুড় গুড়।

স্কুলে গেলেন খোকা। স্কুল ছুটির পর ফিরছিলেন নৌকায় করে। বাড়ির পিছনে খাল পর্যন্ত ঠিকমতোই এলো নৌকা। তারপর হঠাৎ উল্টে গেল।

পানিতে পড়ে গেল সবাই। বই-খাতা ভিজে একাকার। বর্ষার খাল। চওড়ায় হয়ে গেছে তিনগুণ বড়। আর কী ঢেউ খালে! কোনো রকমে সাঁতরে সবাই খালের পাড়ে এলো।

ভেজা শরীর নিয়ে দৌড়ে ছুটল যে যার বাড়ির দিকে।

খোকাকে দেখেই মা আঁৎকে উঠলেন, 'এ কী! তোমার সারা শরীর এমন ভেজা কেন? বৃষ্টিতে ভিজেছ?'

খোকা বললেন, 'আজ আমাদের নৌকা উল্টে গিয়েছিল। আমরা সবাই পানিতে পড়ে গিয়েছিলাম।'

ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন মা। তাঁর নয়নের মণি খোকা। খোকার কিছু হয়ে গেলে যে তিনি সহ্য করতে পারবেন না। তারচেয়ে কাজ নেই স্কুলে গিয়ে। জানিয়ে দিলেন মা, 'কাল থেকে আর তোমার স্কুলে গিয়ে কাজ নেই।'

জীবনে কখনো মায়ের কথার অবাধ্য হননি খোকা। মা যখন যা করতে বলেছেন, হাসিমুখে মেনে নিয়ে করেছেন। খোকাও মাথা নেড়ে সায় জানালেন, আর স্কুলে যাবেন না। সেদিনের পর থেকে আর ওই স্কুলে যাননি খোকা।

স্কুল নেই। খোকার দিনগুলো তখন আরো দারুণ হয়ে উঠল। হাটে-মাঠে-ঘাটে ছুটে বেড়ান। পুকুর, নদী, খালে আরো দাবড়ে বেড়ান। এ গাছ থেকে ও গাছে উঠে যান তরতরিয়ে। খাবারের সময়ও পান না ঠিকমতো।

এক রাতে বাবা জানালেন, খোকাকে নিজের কাছে নিয়ে যাবেন।

গোপালগঞ্জ যাবেন খোকা! থাকবেন বাবার সঙ্গে! শুনেই খুশি হলেন খোকা। খুশি হলেন না মা।

বাবা বোঝালেন, 'খোকাকে ওখানেই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেব। এখানে ওর পড়াশোনা হচ্ছে না। সারা দিন কেবল টইটই করে ঘুরে বেড়ায়। নিজের স্বাধীনমতো চলে।'

হু হু করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন মা, 'খোকাকে ছাড়া আমি কিভাবে থাকব? কদিন আগে কেবল জ্বর থেকে উঠল। এখনও শরীর দুর্বল। কে ওকে খাওয়াবে? এখনও তো নিজের হাতে ঠিকমতো খেতে পারে না। এখন ওর আরো বেশি যত্ন দরকার। দিন দিন শরীরটা কেমন লিকলিকে হয়ে যাচ্ছে।'

কিন্তু বাবা কিছুই শুনতে রাজি নন। বললেন, 'খোকাকে ছেড়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে। ও এখন বড় হচ্ছে। দিন দিন আরো বড় হবে। ওকে আরো বড় হতে হবে। তুমি দেখে নিও, আমাদের খোকা অনেক বড় হবে। জন্মের পর ওর নানার কথা মনে আছে? খোকার নাকি জগৎজোড়া নাম হবে। কথাটা সত্যি হবে।'

কিন্তু মায়ের সেই একই কথা, 'আমি খোকাকে ছাড়া থাকতে পারব না।'

বাবা তখন বললেন, 'তাহলে চলো সবাই একসাথে শহরে থাকবে।'

কিন্তু সেটাও তো মায়ের পক্ষে সম্ভব নয়। ঘরবাড়ি খালি রেখে কিভাবে যাবেন? খালি ঘরে সন্ধ্যাবাতি দেবে কে? ফকির এলে ভিক্ষা দেবে কে? ঘর থেকে খালি হাতে ফকির চলে যাবে, এটা হতে পারে না। তিনি শহরে যেতে চাইলেন না।

আবারও বোঝালেন বাবা, 'এখানে থাকলে খোকা দুনিয়াটা চিনবে কেমন করে? মানুষকে জানবে কেমন করে?'

মায়ের কোনো আপত্তিই আর কানে তুললেন না বাবা। খোকার লেখাপড়া করা দরকার। বড় হওয়া দরকার। মায়ের স্নেহে আর কতদিন?

পরদিন বাবার সঙ্গে গোপালগঞ্জে পাড়ি জমালেন খোকা।

খোকাকে বিদায় জানাতে বড় উঠোন পর্যন্ত এগিয়ে এলেছিলেন মা, ছোট ফুফু আর মেজ বোন। মায়ের কোলে ছিল ছোট ভাই নাসের। বড় বড় চোখে তাকিয়ে ছিল খোকার দিকে। মাত্র এক বছর বয়স। নাসেরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন খোকা। তারপর জড়িয়ে ধরলেন মাকে।

আগে থেকেই বজরা ঠিক করে রেখেছিলেন বাবা। সকাল সকাল বজরা এসে হাজির। খোকার কাপড়-চোপড়, বাবার দরকারি ব্যাগ চলে গেছে বজরায়। রান্না করা খাবারও টিফিন ক্যারিয়ারে গুছিয়ে দিয়েছেন মা। বাবা আর খোকা বজরায় উঠতেই চলতে শুরু করল বজরা। কিছুদূর যাওয়ার পরই হঠাৎ খোকার মনে পড়ল ছোটবোন হেলেনের কথা। মনে পড়ল ভুলুর কথা। পোষা বানরটার কথা।

খোকাকে কাছে টেনে কোলে বসালেন বাবা। তারপর খোকার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'আমার খোকা বড় লক্ষ্মী ছেলে। খোকার মন খুব ভালো। লেখাপড়া করে খোকা একদিন বড় হবে। অনেক বড় হবে। দেশের জন্য কাজ করবে। মানুষের সেবা করবে।'

বাবার আদর পেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন খোকা। হঠাৎ নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগলেন। একটু পর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'এই টুঙ্গিপাড়ায় আবার আমি ফিরে আসব আব্বা। তারপর আর কোথাও যাব না। কোথাও না...।'

গোপালগঞ্জ শহরের ব্যাংক পাড়া। রাস্তাগুলো ছিল বেশ সরু। বড় পুকুরের ধারে খোকাদের অনেক আত্মীয়স্বজন থাকত। নারকেল গাছঘেরা সুন্দর বাড়ির জায়গা আছে ডানপাশে। ওখানেই বাড়ি করার কথা ভাবলেন বাবা। নতুন টিন কিনে এনে সুন্দর করে একটা চৌ-চালা ঘর বানিয়ে নিলেন। বাড়ির উঠানটা খুব সুন্দর। নানান রকম গাছ বাড়ির চারপাশে। বরই, পেয়ারা, লেবু। একটা শিউলি ও জুঁই ফুলের গাছও আছে। ছায়াঢাকা বাড়িতেও মন বসাতে পারলেন না ছোট্ট খোকা। কেবলই টুঙ্গিপাড়ার কথা মনে পড়ে। টুঙ্গিপাড়ায় ছুটে যেতে ইচ্ছে করে।

বাবা বুঝলেন খোকার মন ভালো নেই। মুক্ত পাখিকে খাঁচায় বন্দি করলে যেমন, খোকার অবস্থা শহরে এসে তেমনি হলো। কিন্তু লেখাপড়া তো করতে হবে। খোকাকে ভর্তি করিয়ে দিলেন গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে। চতুর্থ শ্রেণিতে। বাড়ি থেকে স্কুলটা বেশ দূরে। পায়ে হাঁটা পথ। স্কুলটা বড় রাস্তা ধরে নদীর ধারে। প্রথম দিনেই বেশ কজন বন্ধু জুটিয়ে ফেললেন খোকা।

স্কুলে কিন্তু ফাঁকি দেয়ার সুযোগ নেই। রোজকার পড়া রোজ করতে হয়। স্কুলের নিয়মকানুনও ছিল বেশ কড়া। ঠিক সময়মতো স্কুলে হাজির থাকতেই হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠেই পড়তে বসতে হয়। তারপর কিছু খেয়ে স্কুল শেষ করে ফিরতে ফিরতে বিকেল। সন্ধের পর আবার পড়া করতে হয়। একগাদা হোমওয়ার্ক। রোজকার হোমওয়ার্ক রোজই জমা দিতে হয়।

গোপালগঞ্জ এসে আরেকটা নতুন বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন খোকা। সেটা হচ্ছে ব্রতচারী করা।

ব্রত শব্দের অর্থ তপস্যা ও সংযমের সংকল্প। যারা বিশেষ ব্রত নিয়ে চলে, তারাই ব্রতচারী। ব্রতচারীদের প্রথমেই পাঁচটি ব্রতে আস্থা আনতে হয়। একে বলে পঞ্চব্রত। এই পঞ্চব্রত হচ্ছে—জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দ। জীবনের পথে জ্ঞান অর্জনের বিকল্প নেই। শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা ও

কায়িক শ্রমের প্রয়োজন রয়েছে মানুষের। সত্যনিষ্ঠা সমাজ-জাতি-দেশ এবং সর্বমানবের কল্যাণের সহায়ক। 'ঐক্য' প্রসঙ্গে তো প্রচলিত বচনই রয়েছে—একতাই বল। কিংবা দশে মিলি করি কাজ/হারি জিতি নাহি লাজ। শেষ ব্রত হচ্ছে আনন্দ। আনন্দ যে কোনো কঠিন সাধনাকে সহজ করে।

দেশপ্রেম, ঐতিহ্যপ্রীতি, শিষ্টাচার ও সামাজিক আচরণ কেমন হবে—সে বিষয়েও ব্রতচারীদের জন্য কিছু বিধিমালা আছে। যেমন বাকসংযম, স্বরসংযম, ভাষা ব্যবহারের আদর্শ (খিচুড়ি ভাষায় বলিব না)। রাগ-ভয়-ঈর্ষা-লজ্জা-ঘৃণা বর্জনের নির্দেশও আছে। ব্রতচারী একজন আরেকজনের সঙ্গে দেখা হলে হাত তুলে বলবে—জয় সোনার বাংলা।

শিশু ব্রতচারীর জন্য রয়েছে বারোটি পণ।

ছু টব খেলব হাসব
স বায় ভালো বাসব
গু রু জনকে মানব
লি খব পড়ব জানব
জী বে দয়া দানব
স ত্য কথা বলব
স ত্য পথে চলব
হা তে জিনিস গড়ব
শ ক্ত শরীর করব
দ লের হয়ে লড়ব
গা য়ে খেটে বাঁচব
আ নন্দেতে নাচব।

এই ব্রতচারী খোকার মনকে অনেকখানি বদলে দিয়েছিল।

১৯৩৪ সালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেলেন খোকা। তখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়েন। প্রচণ্ড মাথাব্যথা হচ্ছিল কদিন ধরে। খবরটা শুনেই বাবা তাঁকে নিয়ে গেলেন ডাক্তারের কাছে।

ভালোমতো পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, 'খোকার তো বেরিবেরি রোগ হয়েছে। ওর হার্ট দুর্বল হয়ে গেছে। কলকাতায় নিয়ে যাওয়া দরকার। ওখানে ভালো চিকিৎসা হবে।'

দেরি করলেন না বাবা। খোকাকে নিয়ে ছুটলেন কলকাতা। যদিও কলকাতা যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। প্রথমে যেতে হবে গোয়ালন্দ। সেখান থেকে বড় স্টিমারে চেপে কলকাতা। বাবার সঙ্গে কলকাতা এলো খোকা।

কলকাতায় নেমেই খোকার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। বড় বড় দালান! বড় বড় রাস্তা! কত্ত গাড়ি রাস্তায়। কলকাতার নামি ডাক্তারের কাছে ছুটলেন বাবা। চলতে থাকে চিকিৎসা। ওষুধ নিয়ে আবার গোপালগঞ্জ। টানা দুই বছর চিকিৎসা চলল খোকার।

এর মধ্যেই সেরেস্তাদার হয়ে বাবা বদলি হয়ে গেলেন মাদারীপুর মহকুমায়। সেটা ১৯৩৬ সাল।

মাদারীপুর যাওয়ার আগে খোকাকে নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় এলেন বাবা। টুঙ্গিপাড়ায় এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল খোকা। খোকার প্রিয় টুঙ্গিপাড়া।

আবার সরগরম হয়ে উঠল বাড়ি। খোকাকে ফিরে পেয়ে যেন প্রাণ ফিরে পেল সবাই। মিয়াভাই ফিরে এসেছে। কিন্তু টুঙ্গিপাড়ায় কতদিন থাকবে মিয়াভাই?

ইচ্ছে থাকলেও বেশিদিন টুঙ্গিপাড়ায় থাকা হলো না। এবার মাদারীপুর যাওয়ার তাড়া। একদিকে বাবার চাকরি। অন্যদিকে খোকার স্কুল। মাদারীপুর গিয়ে নতুন স্কুলে ভর্তি হতে হবে। টুঙ্গিপাড়া থেকে মাদারীপুর অনেক দূর। যেতে হয় লঞ্চ নয়তো বড় নৌকায়। গোপালগঞ্জ থাকতে তো সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়ি আসা যেত। কিন্তু মাদারীপুর থেকে সেটা সম্ভব নয়। আগের মতো বাড়ি আসতে পারবেন না বাবা।

ওদিকে খোকা অসুস্থ। বাবা তো অফিসে ব্যস্ত থাকবেন। খোকার যত্ন-আত্তি করতে পারবেন না। এবার মাকে সঙ্গে নিলেন বাবা।

বড় নৌকায় করেই মাদারীপুর এলেন খোকা। সঙ্গে বাবা তো আছেনই, আরো আছেন মা, ছোটবোন ও ছোটভাই।

খুব ছোট্ট শহর মাদারীপুর। এখানে ঘরের উপর ঘর। ফাঁকা জায়গা বেশ কম। মাদারীপুর হাইস্কুলে ভর্তি হলেন খোকা। সপ্তম শ্রেণিতে।

কেন যেন মাদারীপুরে খোকার মন বসল না। একে তো নতুন স্কুল। পুরনো বন্ধু-বান্ধব নেই। তারওপর খেলাধুলা করার মতো তেমন মাঠও নেই। স্কুলের সামনে মাঠ বলতে যা আছে, ওখানে খেলতে ইচ্ছে করে না। কেমন যেন লাগে খোকার। সবকিছু ঠিক মতো ঠাহর করতে পারেন না।

স্কুলেও যেতে ইচ্ছে করে না। বাবাকে জানালেন মা। খোকাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছুটলেন বাবা।

ডাক্তার বললেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কলকাতায় নিয়ে যান।

কয়েকদিনের মধ্যেই খোকাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাবা। এবার কলকাতা গিয়ে উঠলেন মেজ বোনের বাসায়। মেজ ভগ্নিপতি চাকরি করেন এজিবিতে। তিনিও শেখ বংশের। খোকাকে পেয়ে মেজ বোন তো ভীষণ খুশি হলেন। কলকাতার বিখ্যাত চক্ষু ডাক্তার টি আহমেদ। বেশ যত্ন করে দেখলেন খোকাকে। জানালেন খোকার গ্লুকোমা হয়েছে। বেশ বাজে ধরনের রোগ। এ রোগে খোকা অন্ধও হয়ে যেতে পারে।

খোকার রোগের কথা শুনে বাবার মুখ শুকিয়ে গেল। ডাক্তার বললেন, 'তবে চিন্তার কিছু নেই। আপনি ঠিক সময়ে নিয়ে এসেছেন। দেরি করলে অবশ্যই বিপদ হতো। এখন যত শিগগির পারা যায় অপারেশন করাতে হবে।'

এবার খোকাকে নিয়ে বাবা ছুটলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। খোকার দুচোখেই অপারেশন করতে হবে।

হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গেল খোকা। অপারেশনের দিনও ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু এ কী! অপারেশনের দিন সকালে হাসপাতাল থেকে পালাতে চাইলেন খোকা। ভাগ্যিস হাসপাতালের লোকজন দেখে ফেলেছিল। তারাই আবার ধরে নিয়ে এলো খোকাকে।

খোকার অপারেশন হয়ে গেল। তবে একসঙ্গে দুচোখে অপারেশন হয়নি। প্রথমে একটা চোখ। দশ দিনের মধ্যে আরেকটা চোখ। যদিও পনের দিন পরে আরেকটা চোখ অপারেশন করার নিয়ম, কিন্তু খোকার চোখের অবস্থা যে ভালো নয়। তাই আর দেরি করলেন না ডাক্তার।

আগে দুচোখেই জ্বালা করত। অপারেশনের পর সেই জ্বলুনি নেই।

খোকার দুচোখেই ব্যান্ডেজ। এসময় বাবা ছিলেন তাঁর পাশে। খাইয়ে দিতেন। বাথরুমে নিয়ে যেতেন। গল্প করতেন। মেজবুজি প্রতিদিনই আসতেন তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। বাড়ি থেকে মজার মজার খাবার নিয়ে আসতেন।

কিছুদিন পর খোকার ব্যান্ডেজ খোলা হলো। চশমা দেয়া হলো। ডাক্তার জানালেন সারা জীবন চশমা পরে থাকতে হবে খোকাকে। আরো

একটা কথা বললেন ডাক্তার। অনেকদিন খোকা লেখাপড়া করতে পারবে না।

চিকিৎসা শেষে মাদারীপুর চলে এলেন খোকা। খোকার খাওয়ার প্রতি আরো বেশি নজর দিলেন মা। স্কুল নেই, লেখাপড়া নেই। এসময় শুধু শুধু মাদারীপুর থাকার কোনো মানেই হয় না। খোকার ইচ্ছায় কিছুদিনের মধ্যে টুঙ্গিপাড়ায় চলে এলেন সবাই।

টুঙ্গিপাড়ায় এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল খোকা। মোটা ফ্রেমের চশমা পরে ঘুরে বেড়ায়। এখানে সেখানে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি।

এমনিতেই খোকার আদরযত্ন আর সবার চেয়ে বেশি। বংশের প্রথম ছেলে বলে কথা! তার ওপর গোপালগঞ্জ আর মাদারীপুর গিয়ে লেখাপড়া করছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, খোকা দুবার কলকাতা ঘুরে এসেছে। বাড়িতে খোকার সমীহ বেড়ে গেল। যে বাড়িতেই যায়, সবাই খোকাকে দেখলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। আর খালারা তো পারলে খোকাকে মাথায় তুলে রাখেন। বারবারান্দায় নিয়ে আদর করে বসাবেন। তারপর খোকার সামনে এনে রাখবেন নানা রকম খাবার। আমসত্ত্ব, নারকেলের নাড়ু, নানান রকম পিঠে, মুড়ির মোয়া, চিড়ার মোয়া। বাড়িতেও তার জন্য রাখা আছে মজার মজার খাবার। বড় বড় কই মাছ ভাজা, রুইয়ের পেটির ঝোল, সোনামুগের ডাল দিয়ে রান্না করা রুইয়ের আস্ত মাথা। খাবার পরে দুধের পায়েস তো আছেই। মাখনও বাদ যায় না। এ-বাড়ি ও-বাড়ি গিয়ে খেয়ে বেড়াতে লাগলেন খোকা। এ ছাড়া তো আর কিছু করার নেই। খেয়ে খেয়েই সময় কাটানো ঢের ভালো। মাথাভরা কালো চুল আর চোখে কালো ফ্রেমের চশমাপরা খোকাকে আদর করে না, এমন মানুষ টুঙ্গিপাড়ায় নেই।

এভাবে খেয়ে ঘুরে বেড়াতে আর কতদিন ভালো লাগে? খোকারও আর ভালো লাগল না। আবার মাদারীপুর ফিরে এলেন। লেখাপড়া নেই, খেলাধুলা নেই। তবে বিকেলে সভায় যাওয়ার অভ্যাস হয়েছে তাঁর।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। সুভাষ বোসের দলের আলোচনাসভায় প্রতিদিন বিকেলে হাজির হন।

একদিন বাবা জানতে চাইলেন, 'খোকা, রোজ বিকেলে কোথায় যাও?'

জবাব দিলেন খোকা, 'আব্বা, আমি এমন কিছু করছি না, যেটা অন্যায়। ব্রিটিশরা আমাদের শোষণ করছে। ওদের তো এ দেশ থেকে তাড়াতে হবে।'

বাবা মুচকি হাসলেন। তাহলে তিনি যা ভেবেছিলেন, ঠিক তাই। খোকা তাহলে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সভায় যায়।

বাবা বললেন, 'কয়েকদিন গোপালগঞ্জেও গিয়েছ শুনলাম।'

খোকা বলল, 'সে খবরও আপনার কাছে চলে গেছে দেখছি।'

সুভাষ বোসের সব সভা মাদারীপুরে হয় না। গোপালগঞ্জেও কিছু কিছু সভা হয়। এবং খোকা সেখানেও গিয়েছিলেন। খবরটা বাবাকে দিয়েছেন খোকার এক দাদা খান সাহেব। বাবার কাকা। খোকার দাদাকে জানিয়েছেন গোপালগঞ্জের এসডিও। গোপালগঞ্জে খোকাকে দেশবিরোধীদের সঙ্গে দেখা গিয়েছে। এবং সাবধান করে দেয়া হয়েছে, যাতে আর দেখা না যায়। বাবাকেও বলে দিয়েছে যাতে খোকাকে চোখে চোখে রাখেন। এর মধ্যেই বাবা আবার গোপালগঞ্জে বদলি হয়েছেন।

আবার গোপালগঞ্জ। খোকা অবশ্য পুরনো স্কুলেই ভর্তি হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাবা রাজি হননি। বলেছিলেন, 'তোমার পুরনো বন্ধুরা সব উপরের ক্লাসে। আর তুমি ওদের চেয়ে অনেক নিচের ক্লাসে—সপ্তম শ্রেণিতে। তোমার বন্ধুরা যদি তোমাকে এড়িয়ে চলে? চলতেই পারে। কারণ পড়াশোনায় তো ওরা তোমার চেয়ে এগিয়ে গিয়েছে। তখন তোমার খারাপ লাগবে না বুঝি?'

গোপালগঞ্জের সবচেয়ে নামি আর ভালো স্কুল—গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি হলেন খোকা। স্কুলের সামনে মাঠও আছে বিশাল। খেলাধুলাও করা যাবে।

একদিন খোকা দেখলেন ওদের গোপালগঞ্জের বাড়িতে নতুন একটা ঘর উঠছে। জানতে পারলেন ঘরটা নতুন মাস্টারের জন্য। খোকার জন্য একজন প্রাইভেট টিউটর ঠিক করেছেন বাবা। কাজী আবদুল হামিদ। হামিদ মাস্টার নামেই সবাই চেনে। খুব ভালো মানুষ। ভালো শিক্ষক তো অবশ্যই।

হামিদ মাস্টার এসে উঠলেন সে ঘরে।

সুন্দর করে ঘর সাজিয়েছিলেন হামিদ মাস্টার। দেয়ালে ঝোলানো

বিখ্যাত মানুষদের ছবি। শেলফে কত্ত বই! হামিদ মাস্টারের ঘরটা খোকার খুব ভালো লেগেছিল।

হামিদ মাস্টারের কাছে পড়া শুরু করে দিলেন খোকা। হামিদ মাস্টার ছিলেন সূর্যসেনের ভক্ত। যুক্ত ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। গান্ধীজির ভক্ত।

সেসময় মুসলমানদের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। বেশিরভাগ মুসলিম ছেলেরা ঠিকমতো স্কুলে আসতে পারে না। যারা নিয়মিত আসে ওদের মধ্যে আবার বেশিরভাগই পড়ালেখায় অমনোযোগী। অনেকের আর্থিক অবস্থা খুবই করুণ। বই-খাতা কিনতে পারা তো পরের কথা, ঠিকমতো স্কুলের বেতনই দিতে পারে না। তাই বলে কি ওরা লেখাপড়া করবে না? ওদের জন্য তো কিছু একটা করা দরকার।

হামিদ মাস্টারের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা সমিতি করলেন খোকা। নাম দিলেন 'মুসলিম সেবা সমিতি।' প্রতি মুসলিম ঘর থেকে একমুঠো করে চাল জোগাড় করা হলো সমিতির মাধ্যমে। সেই চাল বিক্রির টাকা দিয়ে গরিব ও অসহায় মুসলিম ছাত্রদের লেখাপড়ার খরচ চালানো শুরু হলো। চাল সংগ্রহের কাজটা খোকা নিজেই করতেন দলবল নিয়ে। তারপর চাল বিক্রি করে টাকা তুলে দিতেন হামিদ মাস্টারের হাতে। গরিব ছাত্রদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে বিলি-বণ্টন করতেন হামিদ মাস্টার নিজে।

এমন শিক্ষক পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। মনের সঙ্গে মিল, মতের সঙ্গে মিল। অসাধারণ তাঁর পড়ানোর রীতি। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুর সম্পর্ক। কারো বিপদ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়েন। সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন সে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে। এমন শিক্ষকের সঙ্গে খোকার বন্ধুত্ব না হয়ে পারে না। খোকাও তখন হামিদ মাস্টার ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। তাঁর আদর্শ শিক্ষক হামিদ মাস্টার। আর মানুষকে সহজে আপন করেও নিতে জানেন।

কিন্তু একদিন হুট করে হারিয়ে গেলেন হামিদ মাস্টার।

কদিন ধরেই বেশ কাশি হচ্ছিল হামিদ মাস্টারের। রাতের বেলা কাশিটা বেশি ওঠে। চিন্তায় পড়ে গেলেন খোকা। কিছুদিন পর জানা গেল হামিদ মাস্টারের যক্ষ্মা হয়েছে।

আর শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মার কাছে হেরে গেলেন হামিদ মাস্টার। প্রিয় শিক্ষককে হারিয়ে খুব কষ্ট পেলেন খোকা। মুসলিম ছাত্রদের জন্য স্যার যে উদ্যোগটা নিয়েছিলেন, কত ছাত্র যে উপকৃত হয়েছিল! আরো কত ছাত্র আছে, ওদের কী হবে? স্যার নেই, তাই বলে কি স্যারের উদ্যোগ থেমে থাকবে? উঁহু। তা তো হয় না। স্যারের কাজটাকে এগিয়ে নিতে হবে। তবেই তো হামিদ স্যার বেঁচে থাকবেন আরো অনেকদিন।

সবাই ভেবেছিল হামিদ মাস্টারের মৃত্যুর পর 'মুসলিম সেবা সমিতি'র কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু না। এবার সমিতির হাল ধরলেন খোকা। একটা কমিটি করলেন। স্কুলের একজন মুসলিম শিক্ষককে বানালেন সমিতির সভাপতি। আর নিজে হলেন সম্পাদক। স্কুলের কিছু মুসলিম ছাত্র নিয়ে আবার বাড়ি বাড়ি যাওয়া শুরু করলেন। প্রতি রবিবারে। জোগাড় করতে লাগলেন মুষ্টিচাল। সে চাল বিক্রি করে টাকা-পয়সা জমা রাখলেন সমিতির সভাপতির কাছে। সভাপতিই সে সাহায্য বিতরণ করতে লাগলেন।

তবে অনেক মুসলমান বাড়ি থেকে সাহায্য পাওয়া গেল না। তাদের বোঝানোর চেষ্টা করতেন খোকা, 'দেখুন সাহেব, আমরা সবাই মিলে যদি চেষ্টা না করি, তাহলে তো মুসলমানরা পিছিয়ে থাকবে।'

খেপে গিয়ে বাড়ির কর্তা বলতেন, 'চাঁদাবাজি করতে এসেছ? এসব না করে মন দিয়ে লেখাপড়া করো।'

প্রচণ্ড রাগ হতো খোকার। আর মনে মনে ঠিক করে ফেলতেন কী করতে হবে। যেসব বাড়ি থেকে সাহায্য পেতেন না, রাতের বেলা সেসব বাড়ির টিনের চালে আধলা ইট মারতেন। গোপালগঞ্জের মানুষ কিন্তু বুঝে ফেলত, কাজটা কার। নালিশ যেত বাবার কাছে। আর এজন্য শাস্তিও পেতে হয়েছিল তাঁকে।

ছোটবেলা থেকেই খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস ছিল খোকার। বাবা খবরের কাগজ রাখতেন। আনন্দবাজার, বসুমতী, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত। খবরের কাগজে রাজনীতির খবর থাকত বেশি। কিন্তু খোকার তখন রাজনীতির প্রতি আগ্রহ ছিল খুবই কম। তখন তাঁর আগ্রহ খেলাধুলায়। বিকেল হলে স্কুলের মাঠে গিয়ে হাজির হতেন। ফুটবল

তো খেলতেনই। স্কুলের ভলিবল আর হকি দলেও তাঁর নাম ছিল। তবে ফুটবলটা বেশ ভালো খেলতেন। স্কুল টিমে সুযোগও মিলেছে। ফুটবল মাঠেও খোকার কর্তৃত্ব। দল নিয়ে এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় খেলতে যেতেন। মধুমতী পেরিয়ে কখনো যেতেন চিতলমারী কখনো মোল্লারহাট।

খোকা তখন নবম শ্রেণিতে পড়েন। খবর এলো, বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা ফজলুল হক আর শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আসছেন গোপালগঞ্জে। দুই মন্ত্রীর জন্য একটা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। এর দায়িত্বে ছিলেন খোকা।

১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি। ঠিক সময়েই গোপালগঞ্জ এলেন শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সভা শেষে প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক গেলেন পাবলিক হল দেখতে। আর শ্রমমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী গেলেন মিশন স্কুল পরিদর্শনে।

মিশন স্কুলের ছাত্র হিসেবে খোকাই সম্বর্ধনা দিলেন শ্রমমন্ত্রীকে। স্কুল দেখা শেষ। ফিরে যাবেন মন্ত্রী। কিন্তু মন্ত্রীকে তো এভাবে ছেড়ে দেয়া যায় না। স্কুলের কিছু সমস্যা আছে। সেগুলো মন্ত্রীকে জানানো দরকার। সুযোগ খুঁজতে লাগলেন খোকা। মন্ত্রীর চারপাশে নানান মানুষ। মিশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিলাস বাবু, সরকারি কর্মকর্তা আর স্থানীয় গণ্যমান্য মানুষেরা ঘিরে রেখেছেন মন্ত্রীকে। হঠাৎ কয়েকজন ছাত্র নিয়ে মন্ত্রীর পথ আগলে দাঁড়ালেন।

ব্যাপার দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন প্রধান শিক্ষক। এ কী বেয়াদবি মাননীয় অতিথিদের সঙ্গে! মন্ত্রীর সামনে থেকে দলটাকে সরিয়ে দিতে চাইলেন প্রধান শিক্ষক। কিন্তু পারলেন না। খোকা ও তাঁর সঙ্গীরা মন্ত্রীর সঙ্গে কথা না বলে পথ ছাড়বেন না।

ওদিকে মন্ত্রীর নজরে পড়ে গেছেন খোকা। মন্ত্রী তাদের কথা শুনতে চাইলেন। খোকা বললেন, 'হোস্টেলের ভাঙা ছাদ দিয়ে বর্ষাকালে পানি পড়ে। ছাত্রদের বই-খাতা ও বিছানাপত্র সব সময় ভিজে নষ্ট হয়ে যায়। খুব কষ্ট হয় ছাত্রদের।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'আচ্ছা। বিষয়টা আমি দেখব।'

কিন্তু মন্ত্রীর কথায় মোটেই আশ্বস্ত হতে পারলেন না খোকা। পথ

থেকে না সরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন নিজের জায়গায়। বললেন, 'এখুনি হোস্টেলের ছাদ মেরামতের ব্যবস্থা না করলে আমরা কেউ পথ ছাড়ব না। যা হবার হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কাউকে নির্দেশ দিলেন মন্ত্রী, 'আমার ঐচ্ছিক তহবিল থেকে এক্ষুনি ১২০০ টাকা মঞ্জুর করে দাও। এটা হোস্টেলের ছাদ মেরামতের জন্য।'

উপস্থিত সবাই বেশ অবাক হয়ে গেল। এভাবে পথ আটকে মন্ত্রীর কাছ থেকে দাবি আদায় করে নেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। খোকা বলেই পেরেছে।

সবাইকে আরো অবাক করে দিয়ে পাঞ্জাবির পকেট থেকে নোটবুক বের করলেন মন্ত্রী। খোকার নাম ঠিকানা লিখে নিলেন নোটবুকে।

কিছুদিন পর আরো অবাক করা ব্যাপার ঘটল। মন্ত্রীর লেখা চিঠি এলো খোকার নামে।

পরের দিনই চিঠির জবাব দিলেন খোকা। এরপর আবার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর চিঠি এলো খোকার নামে। আবার জবাব দিলেন খোকা।

খোকা আর সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে চিঠি বিনিময় চলতে লাগল। একসময় এই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছ থেকেই নতুন এক জীবনের দীক্ষা পেল খোকা। সে জীবনের নাম সংগ্রাম। সোহরাওয়ার্দী হয়ে উঠলেন খোকার রাজনৈতিক জীবনের দীক্ষাগুরু।

১৯৩৮ সালের মার্চ বা এপ্রিলের কোনো এক সন্ধ্যা। আবদুল মালেককে ধরে নিয়ে গেছে হিন্দুরা। আবদুল মালেক ছিলেন খোকার সহপাঠী। আবার খোকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফিরোজের আত্মীয়। খবর পেয়েই কয়েকজন ছাত্রকে ডেকে নিয়ে খোকা ছুটলেন হিন্দু মহাসভা সভাপতি সুরেন ব্যানার্জির বাড়ি। ওখানেই মালেককে আটকে রাখা হয়েছে। বেশ মারপিটও করেছে।

সুরেনের বাড়িতে অনেক লোকজন। খোকাকে দেখেই খেপে উঠল সবাই। ততক্ষণে খোকার দলের আরো অনেকেই এসে হাজির। দলে ভারি হওয়া মাত্রই জোরাজুরি করতে লাগলেন খোকা। শুরু হলো তুমুল মারপিট।

ঘরের দরজা ভেঙে মালেককে উদ্ধার করলেন। তারপর আর দেরি না করে ফিরে এলেন সবাই।

মামলা করা হলো খোকা ও তার দলের বিরুদ্ধে। পরদিন সকাল নটার মধ্যে বেশ কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে ফেলল। কিন্তু খোকাকে গ্রেফতার করার সাহস পাচ্ছিল না। খোকাকে গ্রেফতার করার ইচ্ছেও ছিল না পুলিশের। সময় নষ্ট করে বাড়ি থেকে সরে যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছিল তাকে।

কিন্তু খোকা পালাননি। বাবা শেখ লুৎফর রহমানকে জানিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সাত দিনের জেল হলো তাঁর। স্কুল জীবনের গণ্ডি না পেরোতেই জীবনের প্রথম কারাভোগ করতে হয়েছে তাঁকে। জীবনের প্রথম কারাভোগ নিয়ে একবার খোকা বলেছিলেন, 'আমার যেদিন প্রথম জেল হয়, সেদিন হতেই আমার নাবালকত্ব ঘুচেছে বোধ হয়।'

১৯৩৯ সালে কলকাতা বেড়াতে গেলেন খোকা।

এবার অন্য চোখে কলকাতা দেখতে থাকেন খোকা। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা হলো। শহীদ সাহেব তো খোকাকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত। পরিচয় করিয়ে দিলেন আবদুল ওয়াসেক সাহেবের সঙ্গে। আবদুল ওয়াসেক তখন ছাত্রদের নেতা। তাকে গোপালগঞ্জে আসার নিমন্ত্রণ করলেন খোকা।

গোপালগঞ্জ ফিরে মুসলিম ছাত্রলীগের কমিটি করলেন। খোকা হলেন সাধারণ সম্পাদক। খোকার বাবা কিন্তু সহজভাবেই মেনে নিলেন এটা।

তবে সবশেষে বাবা বললেন, 'খোকা, আর যাই করো, লেখাপড়ার দিকে নজর দেবে। এ জায়গাতে বিন্দুমাত্র ছাড় দেবে না।'

খোকার তখন লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহও বাড়তে শুরু করে দিয়েছে। এমনিতেই অসুস্থতার জন্য কয়েকটা বছর নষ্ট হয়েছে। আর সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই। নিজে থেকেই মন দিয়ে পড়াশোনা করতে লাগলেন। এছাড়া সময়ও নেই। দুবছর পরে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। এখন পুরোদমে শুধু লেখাপড়া আর লেখাপড়া।

খোকার ফুটবল দলের নামডাক তো অনেক আগেই ছড়িয়েছে। ততদিনে মিশন স্কুল দলের অধিনায়ক হয়ে গিয়েছেন তিনি। মহকুমায় যারা ভালো ফুটবল খেলত, তাদের এনে ভর্তি করিয়ে দিতেন মিশন স্কুলে। শুধু তাই

নয়, ওদের বেতনও ফ্রি করে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

যদিও হার্টের রোগ ছিল খোকার। তবু ফুটবল নিয়ে মাতামাতির কমতি ছিল না। খোকার বাবাও ছিলেন ভালো ফুটবল খেলোয়াড়। গোপালগঞ্জের অফিসার্স ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলেন শেখ লুৎফর রহমান। ওই অফিসার্স ক্লাবেরও একটা ফুটবল দল ছিল। মাঝে মাঝেই অফিসার্স ক্লাবের সঙ্গে খেলা হতো মিশন স্কুলের। বাবা-ছেলের এই একে অন্যের বিপক্ষে ফুটবল খেলা—বেশ উপভোগ করত গোপালগঞ্জের মানুষ। ১৯৪০ সালের কথা। এ জেড খান শিল্ডের ফাইনাল খেলা। অফিসার্স ক্লাবের টাকার কমতি ছিল না। বাইরে থেকে খেলোয়াড় আনত ভাড়া করে। তবু মিশন স্কুলের সঙ্গে পেরে উঠত না। বছরের শেষ দিকের প্রতিযোগিতা। টানা পাঁচদিন ড্র হলো। কোনো বিজয়ী ঠিক হলো না। পঞ্চম খেলাটাও ড্র হওয়ার পর, মাঠেই খোকার বাবা বললেন, 'কাল সকালেই খেলা হবে। জয়ী দল নির্ধারণ হওয়া দরকার।'

খোকা বললেন, 'আপনাদের আর কী আব্বা। আপনারা তো কেউ নিজেরা খেলেন না। আমার দলের ছেলেরা এখন ক্লান্ত। কিছুদিন পর না হয় খেলা হোক।' কিন্তু কিছুদিন পর তো ছেলেগুলো আবার হারানো শক্তি ফিরে পাবে। তখন ওদের হারানো যাবে না। তার চেয়ে ক্লান্ত থাকতে থাকতে খেলাটা খেলিয়ে নেয়া দরকার। অফিসার্স ক্লাবের ইজ্জত বলে কথা।

বাবা বললেন, 'শোনো খোকা, এবার আর বাইরের খেলোয়াড় থাকবে না। অনেক খরচ। এত খরচ পোষানো সম্ভব নয়। অফিসার্স ক্লাবের সদস্যরাই খেলবেন। তবে খেলাটা কাল সকালেই হবে।'

বাবাকে বোঝালেন খোকা, 'কিন্তু আব্বা কাল সকালে তো আমাদের পরীক্ষা। পরীক্ষা বাদ দিয়ে আমার দলের কেউ খেলতে যাবে না। খেলতে হলে আজকেই খেলতে হবে।'

বাবা এবার ছুটে গেলেন গোপালগঞ্জ ফুটবল ক্লাবের সেক্রেটারির কাছে। বললেন, 'খোকাকে বোঝাও।' কিন্তু খোকা কোনোভাবেই খেলতে রাজি হলেন না।

বাপ-বেটার কাছে কয়েকবার ছোটাছুটি করে বড্ড বিরক্ত হলেন সেক্রেটারি। বললেন, 'ধ্যাত্তেরি! এটা এখন দেখছি তোমাদের বাপ-বেটার

ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি আর ছুটতে পারছি না। তোমরা যা খুশি করো গিয়ে।'

যাই হোক, পরদিন সকালেই দলবল নিয়ে মাঠে হাজির হলেন খোকা। কিন্তু দলের বেশিরভাগ খেলোয়াড় অসুস্থ ছিল। ফলে যা হবার তা-ই হলো। বছরের শেষ খেলাটায় অফিসার্স ক্লাবের কাছে মাত্র এক গোলে হেরে গেল খোকার দল।

একটু পর স্কুল ছুটি হবে। প্রতিদিনের মতো বড় রাস্তার উপর এসে দাঁড়িয়ে রইলেন মা। ঠিক দুপুর তখন। রাস্তার ধারে আমগাছের ছায়ায় মা দাঁড়িয়ে আছেন। খোকাও জানেন মা ওখানে অপেক্ষা করে আছেন। দূর থেকেই মাকে দেখে চওড়া হাসি ফুটে ওঠে খোকার মুখে। দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরেন মাকে। খোকার মুখটা দুহাত দিয়ে ধরে মা বলেন, 'ইস। নিশ্চয়ই তোমার খুব খিদে পেয়েছে খোকা? চোখমুখ একেবারে বসে গেছে। চলো। আজ তোমার পছন্দের কই মাছ ভাজা করেছি।'

ওদিকে খোকার তিন সহপাঠী যে দাঁড়িয়ে আছে, মনেই ছিল না কারো। খোকা বললেন, 'যাবে আবার কী! চলো আমার সঙ্গে। কইভাজা দিয়ে ভাত খাবে।'

ছেলেগুলোর মুখের দিকে তাকালেন মা। ওদেরও চোখমুখ শুকনো। নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে সবার। কে জানে কত দূরে বাড়ি ওদের। যেতে নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ লাগবে।

মা-ও গলা মেলান খোকার সঙ্গে, 'হ্যাঁ, বাবা, চলো। তোমরাও চলো।'

এবার খোকা আর মায়ের পিছন পিছন আসতে থাকে ওরা। মায়ের কানের কাছে এসে ফিস ফিস করে জানতে চান খোকা, 'বেশি করে ভাত রান্না করা আছে তো আম্মা?'

স্কুল খোলা থাকলে প্রতিদিন দুপুরে বেশি রান্না করেন মা। স্কুল বন্ধ থাকলেও মাঝে মাঝে করতে হয়। হোস্টেলে যে ছেলেরা থাকে, ওদের বাড়িতে ডেকে এনে ভালোমন্দ খাওয়াতেন খোকা। মা কিন্তু রাগ করতেন না।

কোনো কোনো দিন হঠাৎ মা জানতে চাইতেন, 'খোকা, তোমার ছাতা কোথায়?'

খোকার জবাব, 'ছাতাটা আজ একজনকে দিয়ে দিয়েছি। ওর কোনো ছাতা নেই। কত দূর থেকে আসে! আমার তো এইটুকুন পথ।'

রাতে বাবাকে বলতেন মা, 'একটা ছাতা লাগবে। খোকার ছাতা নেই।'

বাবা অবাক হয়ে বলতেন, 'দুদিনও হয়নি ছাতা কিনে দিয়েছি। সেটা কোথায়? হারিয়ে এসেছে নাকি দিয়ে এসেছে?'

মা বলতেন, 'খোকার ছাতা কখনো হারায় না।'

বাবা বলতেন, 'তাহলে ঠিক আছে। যার দরকার তাকে দিয়েছে। এ আর এমন অসুবিধা কী।'

মা বলতেন, 'কালই আনবেন। বৃষ্টিবাদলার দিন। নইলে স্কুল থেকে আসার সময় বৃষ্টি হলে বই-খাতা ভিজে নষ্ট হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা, কালই আনব।'

মাঝে মাঝে ছোটবোন হেলেন মনে করিয়ে দিতেন, 'মিয়াভাইয়ের শার্টও লাগবে আব্বা।'

'শার্ট কেন আবার? ওর তো কয়েকটা শার্ট।'

'একটাও নেই আব্বা। দেখেন না খালি গেঞ্জি পরে ঘোরাঘুরি করে।'

'শার্টের কী হয়েছে আবার?'

'দিয়ে এসেছে।'

কথাটা শুনে খুব ভালো লাগত বাবার। খোকাটা বড্ড দিলখোলা। কারো কোনো অসুবিধা দেখলেই হলো, যেভাবেই হোক, উপকার করার চেষ্টা করবে। নিজের গায়ের জামা খুলে দিতেও দুবার ভাববে না। কয়েকদিন আগে একটা পাঠ্যবই দ্বিতীয়বার কিনে দিতে হয়েছে খোকাকে। ক্লাসে কে যেন বই কিনতে পারেনি, ওকে নিজেরটা দিয়ে দিয়েছে। আর প্রতি শীতে খোকার জন্য কয়েকটা চাদর কিনতে হয়। শীতে যারা কষ্ট পায়, তাদের দিতে হয় যে!

১৯৪১ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলেন খোকা। রসরঞ্জন বাবুর কাছে ইংরেজি প্রাইভেট পড়েছেন। মনোরঞ্জন বাবুর কাছে পড়েছেন গণিত। পরীক্ষার প্রস্তুতি তাঁর ভালোই হলো। কিন্তু পরীক্ষার একদিন আগেই ভীষণ জ্বর হলো তাঁর। মামস হয়ে ফুলে গেল গলা। জ্বর উঠল একশো চার। সারা

রাত ছেলের পাশে বসে রইলেন বাবা। গোপালগঞ্জ শহরের প্রায় সব ডাক্তার ডেকে আনলেন বাসায়। জ্বর কমল না। বাবা বললেন, এই জ্বর নিয়ে তোমার পরীক্ষা দেয়া ঠিক হবে না। তুমি আগামী বছর পরীক্ষা দাও।

খোকা বললেন, এমনিতেই অনেকগুলো বছর নষ্ট হয়েছে। আমি এ বছরই পরীক্ষা দেব। আর সময় নষ্ট করতে চাই না। আমার জন্য বরং বিছানার ব্যবস্থা করেন। শুয়ে শুয়ে হলেও পরীক্ষা দেব।

প্রথম দিন ছিল বাংলা পরীক্ষা। সকালে একটা, বিকালে আরেকটা। সকালের পরীক্ষায় বিছানা থেকে মাথা তুলতেই কষ্ট হয়েছিল তাঁর। শুয়ে শুয়ে যতটুকু সম্ভব লিখেছেন। বিকেলের দিকে জ্বর কিছুটা কমে আসায় পরীক্ষাও মোটামুটি ভালো হয়েছিল। অন্য পরীক্ষাগুলোও ভালো হয়েছিল। খোকা ভেবেছিলেন তিনি প্রথম বিভাগে পাস করবেন। কিন্তু প্রথম বিভাগ পেলেন না।

ফলাফলের পর ভর্তি হলেন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে। এতদিন পর্যন্ত ছোটরা তাঁকে ডাকত মিয়াভাই বলে। বড়রা খোকা। ইসলামিয়া কলেজে পরিচিতি পেলেন মুজিবভাই কিংবা মুজিবর নামে। কলেজে ভীষণ জনপ্রিয় ছিলেন মুজিব। থাকতেন বেকার হোস্টেলে। ছাত্রদের বিপদে-আপদে সবসময় পাশে দাঁড়াতেন। কোন ছাত্রের কী অসুবিধা হচ্ছে, কোন ছাত্র হোস্টেলে জায়গা পাচ্ছে না, কার ফ্রি সিট দরকার—সব কিছুর খোঁজ রাখতেন। ছাত্রদের বিপদে ছুটে যেতেন প্রিন্সিপাল ড. জুবেরী সাহেবের কাছে। যেহেতু আবদার অন্যায় ছিল না, তাই শিক্ষকরা তাঁর কথা রাখতেন।

রাজনীতি করার কারণে বিভিন্ন জেলার ছাত্রনেতারা তাঁর কাছে আসতেন। তাদের থাকার জায়গা দরকার। কোথায় রাখবেন? নিজের ঘরটা তো অসহায় ছাত্রদের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। হোস্টেলের সিট না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর ঘরেই থাকত ছাত্ররা। একদিন সুপারিনটেনডেন্ট সাইদুর রহমানকে বললেন, 'স্যার, কোনো ছাত্র রোগগ্রস্ত হলে যে কামরায় থাকে, সেই কামরাটা আমাকে দিয়ে দেন। সেটা অনেক বড় কামরা। দশ-পনেরজন লোক থাকতে পারে।'

বড় কামরাটায় একটা বিজলি পাখাও ছিল। গরমে এর চেয়ে আরাম আর কী হতে পারে! সাইদুর রহমান স্যার জানতেন, মুজিবের কাছে অনেক

অতিথি আসে। না করলেন না তিনি। কেবল বললেন, 'ঠিক আছে, দখল করে নাও। কোনো ছাত্র যেন নালিশ না করে।'

জবাবে মুজিব বললেন, 'কেউই কিছু বলবে না। দু-একজন আমার বিরুদ্ধে থাকলেও সাহস পাবে না।'

মুজিবের বিপক্ষে কিছু ছাত্র ছিল ঠিকই, তবে সাধারণ ছাত্ররা তাদের পছন্দ করত না। এর ফলাফল দেখা গেল ছাত্রসংসদ নির্বাচনে। অফিসিয়াল ছাত্রলীগের প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থী দিলেন শেখ মুজিব। এবং তাঁর প্রার্থীই নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল। ১৯৪৩ সালের নির্বাচনেও একই ঘটনা ঘটল। এর পরের তিন বছর শেখ মুজিবের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে কেউ নির্বাচন করেনি। ছাত্রনেতাদের নিয়ে আলোচনা করে তিনি যাদের নাম ঠিক করে দিতেন, তারাই নমিনেশন দাখিল করত।

রাজনীতি নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত শেখ মুজিব। ছাত্রলীগ তো সামাল দিতে হয়ই, মুসলিম লীগেরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হয় তাঁকে। কোনো কাজেই কখনো না করেন না। নেতারা ভীষণ পছন্দ করেন তাঁকে। ইসলামিয়া কলেজে গরিব ছাত্রদের সাহায্য-সহযোগিতা দেয়ার জন্য একটা ফান্ড ছিল। সেই ফান্ড দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল এক হিন্দু শিক্ষকের। নারায়ণ বাবু। বিজ্ঞানের শিক্ষক। শেখ মুজিব কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না। তবু শেখ মুজিবকে খুব ভালোবাসতেন। যদিও তিনি জানতেন শেখ মুজিব সবসময় পাকিস্তান পাকিস্তান করে বেড়ান।

ইসলামিয়া কলেজের সকল ছাত্রই মুসলমান। হিন্দু শিক্ষক হয়েও মুসলমান ছাত্রদের কাজের ভার ছিল তার উপর। কারণ তিনি ছিলেন সত্যিকারের শিক্ষক। শিক্ষকদের কোনো ধর্ম থাকে না। তিনি কেবলই শিক্ষক। ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা উঠত। সরকারও সাহায্য করত ফান্ডের জন্য। আবার নিজের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে জমা করতেন। ছাত্রদের সাহায্য করতেন। শেখ মুজিব জানিয়েছেন, 'এই রকম সহানুভূতিপরায়ণ শিক্ষক আমার চোখে খুব কমই পড়েছে।'

১৯৪৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হলো বাংলায়। গ্রাম থেকে লাখ লাখ মানুষ ছুটে আসছে শহরে। খাবার নেই, কাপড় নেই। যুদ্ধের জন্য সকল নৌকা বাজেয়াপ্ত করেছে ইংরেজ সরকার। ধান, চাল জব্দ করেছে সৈনিকদের খাওয়ানোর জন্য। ব্যবসায়ীরাও মওকা পেয়ে গেছে। দশ

টাকা মণের চাল বিক্রি করছে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা মণ দরে। প্রতিদিনই রাস্তার উপর মানুষ মরে থাকতে দেখা যায়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন সাপ্লাই মন্ত্রী। সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে পরামর্শ করে কাজে নেমে পড়লেন মুজিব। গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা খোলার নির্দেশ দিলেন সোহরাওয়ার্দী। দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারকে ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা জানালেন। বজরায় করে আনাতে শুরু করলেন চাল, আটা, গম। ট্রেনে আনার সুযোগ ছিল না। ইংরেজদের কথা ছিল বাংলার মানুষ মরছে মরুক, তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। আগে যুদ্ধের সরঞ্জাম বহন করতে হবে। দুর্ভিক্ষের পরও এ দেশের মানুষের জন্য সামান্যতম দয়াও ছিল না ইংরেজদের। মুজিব বলেছেন, 'যুদ্ধ করে ইংরেজ, আর না খেয়ে মমরে বাঙালি; যে বাঙালির কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলাদেশ দখল করে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়, তখন বাংলার এত সম্পদ ছিল যে, একজন মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী গোটা বিলাত শহর কিনতে পারত।'

অথচ সেই বাংলাদেশের এ কী দুরবস্থা। বাংলাদেশের মানুষের দুরবস্থা নিজের চোখে দেখলেন মুজিব। খাবার দিতে না পেরে ছেলেমেয়েদের রাস্তায় ফেলে দিয়ে মা পালিয়ে গেছেন। বাপ তো আগেই হাওয়া। কেউ কেউ পেটের দায়ে ছেলেমেয়ে বিক্রিও করার চেষ্টা করছে। তা-ও ক্রেতা নেই। বাড়ির দুয়ারে এসে আর্তনাদ করছে মায়েরা, 'মা বাঁচাও, কিছু খেতে দাও। আর পারি না। একটু ফেন দাও।' বলতে বলতেই বাড়ির দুয়ারে মরে পড়ে থাকে অনেকে। বেকার হোস্টেলের বেঁচে যাওয়া খাবার বিলিয়ে দেন। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুজিব। মুসলিম লীগ অফিসে, কলকাতা মাদ্রাসাসহ অনেক জায়গায় লঙ্গরখানা খুললেন। দিনে একবেলা খাবার দিতেন। সারা দিন দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেবা করতেন। রাতে কখনো হোস্টেলে ফিরে আসতেন, কখনো লীগ অফিসের টেবিলে শুয়ে থাকতেন।

এছাড়া প্রত্যেক মহকুমায় রিলিফ পাঠানোর দায়িত্বও ছিল তাঁর ওপর। যুদ্ধের সময় মালপত্র পাঠানোও ছিল কষ্টকর। দশ দিন ঘোরাঘুরি করলে কিছু কিছু কাপড় পাঠানোর মতো জায়গা পাওয়া যেত। নিজের হাতেও কাপড়ের গাঁট বেঁধেছেন মুজিব।

কলেজে থাকতে পাকিস্তান আন্দোলনে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়েন। মুসলমানদের জন্য পাকিস্তানের বিকল্প কিছু নেই। মুসলমানদের দেশ পাকিস্তান গড়ার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন মুজিব। তখনই জানা গিয়েছিল, পাকিস্তান হবে দুটো। আর সেটা হবে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে। একটা বাংলা ও আসাম নিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান' স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র; আরেকটা হবে পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সীমান্ত ও সিন্ধু প্রদেশ নিয়ে 'পশ্চিম পাকিস্তান'। এটাও হবে স্বাধীন সার্বভৌম। অন্যটা হবে হিন্দুস্থান। ওখানে হিন্দুরাই থাকবে সংখ্যাগুরু। তবে সমান নাগরিক অধিকার পাবে হিন্দুস্থানের মুসলমানরাও। ভারতবর্ষের একটা মানচিত্র সবসময় সঙ্গে রাখতেন মুজিব। আর থাকত দুটো বই। দুটোই বইয়েরই নাম এক-পাকিস্তান। দুটো বইয়ের দুই লেখক-হবীবুল্লাহ বাহার ও মুজিবুর রহমান খাঁ। বই দুটো এতবার পড়েছিলেন মুজিব, প্রায় মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। দৈনিক আজাদ পত্রিকার কাটিংও রাখতেন ব্যাগে। সুযোগ পেলে সেগুলো বার বার পড়তেন। সিপাহি বিদ্রোহ ও ওহাবি আন্দোলনের ইতিহাসও জানা ছিল তাঁর। এ দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করতেন মুজিব। শুধু পড়াশোনাই নয়, জানার চেষ্টা করতেন অনেক কিছু। কেমন করে মুসলমানদের কাছ থেকে ব্রিটিশরা ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল? কেমন করে রাতারাতি মুসলমানদের সর্বস্বান্ত করে হিন্দুদের সহায়তা করেছিল ব্রিটিশরা? মুসলমানদের বিতাড়িত করা হয়েছিল ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারি, সিপাহির চাকরি থেকে। মুসলমানদের সে জায়গায় হিন্দুদের দিয়ে পূরণ করেছিল। কেন করেছিল? সেটাও জানার চেষ্টা করতেন। ইংরেজরা আসার আগে পর্যন্ত ভারত শাসন করত মুসলমানরা। তাই স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজদের গ্রহণ করতে পারেনি। সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করত।

মুজিবের অনেক হিন্দু বন্ধু ছিল। একসাথে লেখাপড়া করতেন, খেলাধুলা করতেন, বেড়াতেন। কিন্তু কোনো হিন্দু বন্ধু তাদের ঘরের মধ্যে নিতে সাহস পেত না। একটা ঘটনার কথা জানিয়েছেন মুজিব।

তাঁর এক সহপাঠী বন্ধু ছিল। ননীকুমার দাস। কাছাকাছি বাসা ছিল। সারা দিন মুজিবের সঙ্গে তাঁদের বাসায় কাটাত। এবং গোপনে মুজিবের সাথে খেতও। ননীকুমার থাকত কাকার বাসায়। একদিন ওদের বাড়িতে যান মুজিব। মুজিবকে নিজের ঘরে নিয়ে যায় ননীকুমার। ননীর কাকিমাও

মুজিবকে খুব ভালোবাসতেন। তো কিছুক্ষণ ননীদের বাসায় থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলেন মুজিব। খানিক পরে ননী এসে হাজির। মুজিব জানতে চাইলেন, 'ননী কি হয়েছে?'

ননী বলল, 'তুই আর আমাদের বাসায় যাস না। কারণ তুই চলে আসার পরে কাকিমা আমাকে খুব বকেছে তোকে ঘরে আনার জন্য এবং সমস্ত ঘর আবার পরিষ্কার করেছে পানি দিয়ে ও আমাকে ঘর ধুতে বাধ্য করেছে।'

মুজিব চটপট বললেন, 'যাব না। তুই আসিস।'

সব হিন্দু যদিও এমন ছিল না তবু অনেকের এমন ব্যবহারে বাঙালি মুসলমান যুবকদের ও ছাত্রদের মধ্যে জাতক্রোধ সৃষ্টি হয়েছিল। হিন্দুদের কয়েকটা গ্রামও ছিল, সেগুলোর বাসিন্দারা ছিল মুজিবের পূর্বপুরুষ বংশের কোনো না কোনো শরিকের প্রজা।

হিন্দু মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচারে বাংলার মুসলমানরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ইংরেজদের সাথে অসহযোগিতা করার এটাও একটা কারণ ছিল। ইংরেজি ভাষা না শিখে, তাদের চাকরি না করে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে গ্রহণ করে এগিয়ে গিয়েছিল হিন্দুরা। ইংরেজদের বিরুদ্ধে অনেক হিন্দু লড়াই করেছিল। অনেকে মরতেও দ্বিধা করেনি। অনেকে সারা জীবন কারাভোগও করেছে। এ সময় এসব নিঃস্বার্থ স্বাধীনতাসংগ্রামী ও ত্যাগী ব্যক্তি যদি আন্দোলনের সাথে সাথে হিন্দু ও মুসলমানদের মিলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেন এবং মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার ও জুলুম হিন্দু জমিদার ও বেনিয়ারা করেছিল, সেসবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন—তাহলে হিন্দু-মুসলিম তিক্ততা বাড়ত না। এই তিক্ততার সুযোগ নিয়েছিল শাসক ইংরেজ।

দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ সম্মেলন। প্রত্যেক ডেলিগেট নিজের টাকাতেই যাবেন। মুজিবও যাবেন। সঙ্গে যাবেন ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সেক্রেটারি মীর আশরাফউদ্দিন। নিজেদের টাকায়। মীর আশরাফউদ্দিন ওরফে মাখন হচ্ছেন মুজিবের খালাত বোনের ছেলে। মুন্সীগঞ্জের কাজী কসবা গ্রামে বাড়ি। বাবা-মা নেই। ছোটবেলাতেই মারা গেছেন। তবে যথেষ্ট টাকা পয়সা রেখে গেছেন। মাখনের বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁদের যাওয়ার কথা শুনে খুশি হলেন সোহরাওয়ার্দী।

বললেন, 'খুব ভালো। দেখতে পারবে সমস্ত ভারতবর্ষের মুসলমান নেতাদের।' মামা-ভাগ্নে রওনা হলেন দিল্লি। মাখনের তো টাকার অভাব নেই। শেখ মুজিব এর ওর কাছ থেকে টাকা জোগাড় করতেন। বোন, মা, স্ত্রী আর বাবার কাছ থেকে। হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপে দিল্লিতে রওনা হলেন তাঁরা। এই সুযোগে দিল্লির লালকেল্লা, জামে মসজিদ, কুতুব মিনারসহ ঐতিহাসিক জায়গাগুলো দেখবেন। নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগায় যাবেন। দিল্লি গিয়ে অবশ্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। টাকার অভাবে ভাত-রুটির বদলে ফল খেয়ে ছিলেন। ফেরার সময় হয়ে গেলেন তিনজন। তৃতীয়জন নূরুদ্দিন। তাঁর কাছেও টাকা পয়সা নেই। বেকার হোস্টেলে থাকতেন। দিল্লিতে খাবার খরচ বেশি। তার ওপর নানান জায়গা ঘুরে দেখলেন। ঘোরাঘুরি শেষে হিসাব করে দেখলেন তিনজনের টিকেট করার মতো টাকা তাঁদের কাছে নেই। তবে দুজনের টিকেট করা যায়। ওদিকে দুজনের টিকেট করলে আবার না খেয়ে থাকতে হবে। তাহলে উপায়? তিনজন বসলেন পরামর্শে। ঠিক হলো একটা টিকেট করা হবে। এবং কোনো সার্ভেন্ট ক্লাসে উঠে পড়বেন। যদি ধরা পড়েই যান, তাহলে হাওড়া গিয়ে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

তখনকার ট্রেনে প্রথম শ্রেণির যাত্রীদের গাড়ির সাথেই চাকরদের জন্য একটা করে ছোট্ট গাড়ি থাকত। ওটা সাহেবদের চাকরদের জন্য। চাকররা ওখানে থেকেই সাহেবদের কাজকর্ম করে দিয়ে যেত।

তৃতীয় শ্রেণির একটা টিকেট কেনা হলো হাওড়া পর্যন্ত। দুখানা প্লাটফর্ম টিকেট কিনে স্টেশনের ভিতরে এলেন তিনজন। এখন সার্ভেন্ট বগিতে কে উঠবেন? মাখনের চেহারা ছিল খুব সুন্দর। তাকে দেখলে চাকর বলে মনেই হয় না। সাহস করে তিনজন উঠে পড়লেন সার্ভেন্ট বগিতে। আর উঠেই মাখনকে বললেন মুজিব, 'তুমি উপরে উঠে শুয়ে থাকো। তোমাকে দেখলে ধরা পড়ব।'

মাখন চটপট উপরে উঠে শুয়ে পড়লেন। সাধারণত সার্ভেন্ট বগিতে টিকেট চেকার আসে না। যদি এসেই যায়, তখন নূরুদ্দিন সাহেবকে সামনে রাখবেন। ঘটলও তাই। এক চেকারের মুখোমুখি হয়ে গেলেন তাঁরা। চেকার জানতে চাইল, তোমরা কোন সাহেবের লোক? নূরুদ্দিন ঝটপট উত্তর দিলেন, 'মোমেন সাহেব কা।'

এই মোমেন সাহেব হচ্ছেন খান বাহাদুর আবদুল মোমেন। আবার নূরুদ্দিনকে খান বাহাদুর সাহেব চিনতেন। রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বার ছিলেন তিনি। তবে কোনো বিপত্তি ছাড়াই হাওড়া এলেন তাঁরা। কিন্তু প্লাটফর্ম থেকে বেরুবেন কী করে? টিকেট তো একটা। আবার পরামর্শ তিনজনের। এবার ঠিক হলো টিকেট নিয়ে সকলের মালপত্রসহ বেরিয়ে যাবে মাখন। মালপত্র কোথাও রেখে তিনখানা প্লাটফর্ম টিকেট নিয়ে আবার ঢুকবে। তারপর তিনজন একসাথে বেরিয়ে যাবেন।

গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে মাখন নেমে গেলেন মালপত্র নিয়ে। শেখ মুজিব আর নূরুদ্দিন ময়লা জামাকাপড় পরে ঘোরাঘুরি করছেন। যাতে কেউ বুঝতে না পারে তাঁরা দিল্লি-ফেরত। শেখ মুজিব তাঁর চশমা খুলে লুকিয়ে রেখেছেন। খানিক পরে প্লাটফর্মের টিকেট নিয়ে মাখন ফিরলেন। আর নিরাপদে প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এলেন তিনজন।

এটাই ছিল মুজিবের প্রথম বাংলার বাইরে যাওয়া।

এরপর মুসলিম লীগের দলীয় কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মুজিব। পুরো ভারতে নির্বাচনে অংশ নেয় মুসলিম লীগ। এবং বাংলাদেশ ও মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোতে মুসলিম লীগ একচেটিয়াভাবে জয়লাভ করে। মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চল—পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্তপ্রদেশে এককভাবে জয়লাভ করতে পারেনি। আর এ কারণে শুধু বাংলাদেশে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সরকার গঠন করে মুসলিম লীগ। পুরো ভারতে তখন ছিল এগারটা প্রদেশ। চারটা সংখ্যাগুরু প্রদেশ।

১৯৪৬ সালের এপ্রিল। দিল্লিতে সমস্ত ভারবর্ষের মুসলিম লীগপন্থি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের কনভেনশন হবে। বিশেষ ট্রেনে বাংলা ও আসামের মুসলিম লীগ সংসদ সদস্য ও কর্মীরা দিল্লি যাত্রা করলেন। ট্রেনের নাম দেয়া হলো 'পূর্ব পাকিস্তান স্পেশাল।' বাংলাদেশ থেকে দশ-পনেরজন ছাত্রকর্মী কনভেনশনে যোগদান করবেন। এর মধ্যে মুজিবও ছিলেন। কনভেনশন শেষে আজমীর শরীফ যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল মুজিবের। দু বছর আগেও পরিকল্পনা করে যেতে পারেননি। এবার যাবেনই। সুযোগ পেয়ে দিল্লি শহরটাকেও ভালো মতো দেখে নিলেন মুজিব। দলবল নিয়ে আজমীর শরীফ গেলেন। আজমীর পৌঁছতেই অনেক লোক এগিয়ে এলেন। তাদের সঙ্গে থাকার অনুরোধ করলেন। যারা এই

অনুরোধ করেন, তারা সবাই আজমীর শরীফের খাদেম। বাইরে থেকে কোনো অতিথি এলে খাদেমরা তাদের কাছে নিয়ে রাখেন। তারাই অতিথিদের থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করেন। আর যা যা খরচ হয়, সেগুলো অতিথিকে দিতে হয়। ফেরার সময় অতিথিরা যা দেয়, সন্তুষ্ট হয়ে সেটাই গ্রহণ করে খাদেমরা। এই টাকা থেকে একটা অংশ দরগাহ কমিটিকে দেয় খাদেমরা। কারণ দরগায় প্রচুর খরচ। খাজাবাবার দরগায় কোনো লোক না খেয়ে থাকে না। একদিকে রান্না হতে থাকে, অন্যদিকে শত শত মানুষ খেতে থাকে।

দরগায় গিয়ে অবাক হলেন মুজিব। হাজার হাজার মানুষের আনাগোনা। কেউ সেজদা দিয়ে পড়ে আছে। কেউ চিৎকার করে কাঁদছে। কেউ কেবল দুচোখের পানি ঝরাচ্ছেন। তবে সকলের মুখে একই কথা, খাজাবাবা দেখা দে।

ওদিকে দরগার পাশে হারমোনিয়াম বাজিয়ে 'কাওয়ালী' গাওয়া হচ্ছে।

এরপর মুজিবরা গেলেন তারাগড় পাহাড়ে। ওখানেও কয়েকটা মাজার রয়েছে। এরপর গেলেন আনার সাগর। আনার সাগর হচ্ছে হ্রদ। হ্রদের একপাশে মুঘল আমলের কীর্তি। বাদশা আর বেগমরা এসে এখানে বিশ্রাম নিতেন। তবে বাদশা শাহজাহানের কীর্তিই ছিল সকলের চেয়ে বেশি। সেখানে সন্ধ্যা কাটালেন মুজিব।

পরদিন আজমীর থেকে ট্রেনে করে আগ্রা গেলেন। পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম এই নিদর্শন দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন মুজিব। তিনি যা কল্পনা করেছিলেন, আগ্রা তারচেয়েও সুন্দর। এর ফাঁকেই আগ্রা দুর্গ ও ইতমতউদ্দৌলাও দেখে নিলেন তাঁরা। ইতমতউদ্দৌলা হচ্ছে বেগম নূরজাহানের পিতার কবর। আগ্রা দুর্গে গিয়ে দেখলেন দেওয়ানি আম, মতি মসজিদ, মছি ভবন, নাগিনা মসজিদ, দেওয়ানি খাস ও জেসমিন টাওয়ার।

তাজমহল দেখার পরদিন ফতেহপুর সিক্রি ও সেকেন্দ্রা দেখে নিলেন। ফতেহপুর সিক্রি ছিল সম্রাট আকবরের রাজধানী। ফতেহপুর সিক্রির সামনে বিরাট এক ময়দান। এর নাম খানওয়া। এখানেই সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন সম্রাট বাবর। এরপর আবুল ফজলের বাড়ি, মিয়া তানসেনের বাড়িও দেখেছেন মুজিব।

এই ফতেহপুর সিক্রি আকবরের তৈরি। আট বর্গমাইল জায়গার মধ্যে দুই হাজার নয়শো ঘর ছিল। ফতেহপুর সিক্রিতে আকবরের সকল অমাত্য থাকার পরেও ষাট হাজার সৈন্য থাকতে পারত। এরপর সেকেন্দ্রায় সম্রাট আকবরের সমাধি দেখলেন। সেকেন্দ্রা থেকে চলে গেলেন তুন্দলা স্টেশনে। এখান থেকে হাওড়ার ট্রেন ধরলেন। পরদিন হাওড়া পৌঁছলেন। তবে প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে নিজের সুটকেস হারিয়ে ফেলেছিলেন।

এবার লেখাপড়া করার কথা ভাবলেন মুজিব। কলেজের বেতন বাকি পড়ে গিয়েছে। এ বছর বেতন দেয়া হয়নি। টাকা পয়সার অভাব যাচ্ছে। অনেক টাকা দরকার। বাড়ি গিয়ে বাবার কাছ থেকে নিয়ে আসতে হবে। জামা-কাপড়ও বানাতে হবে নতুন করে। সুটকেসের সঙ্গে তাঁর কাপড়-চোপড়ও হারিয়ে গেছে। চাইতেই বাবা টাকা দিলেন। আর বললেন, 'কোনো কিছুই শুনতে চাই না। বিএ পাস ভালোভাবে করতে হবে। অনেক সময় নষ্ট করেছ। পাকিস্তানের আন্দোলন বলে কিছুই বলি নই। এখন কিছুদিন লেখাপড়া করো।'

কলকাতা ফিরে কলেজের বেতন পরিশোধ করলেন। এবং লেখাপড়ায় মনোযোগ দিলেন। তাঁর বইপত্র ছিল বন্ধুদের কাছে। বন্ধুদের কাছ থেকে নিজের বইগুলো চেয়ে আনলেন।

এর মধ্যে শুরু হলো দাঙ্গা। ১৬ আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে ঘোষণা করেছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। এর বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার

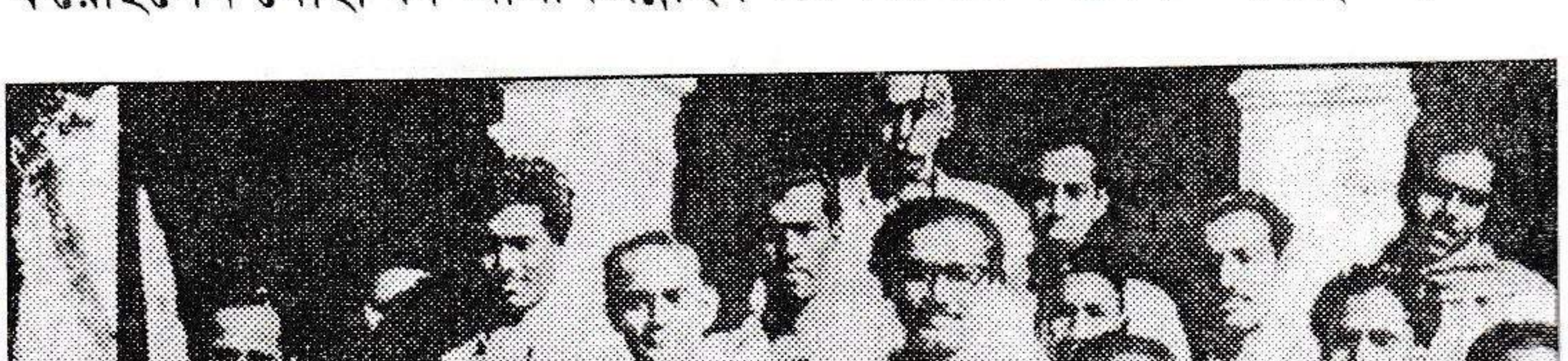

নেতারা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করল ওই দিন। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস। মুজিব ও তাঁর দল সবাইকে বোঝাতে চাইলেন মুসলমানদের দাবি হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। হিন্দু মুসলিম এক হয়ে দিবস পালনের চেষ্টা করতে লাগলেন। হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের মিথ্যাচারের কাছে হেরে গেলেন তাঁরা। ১৬ আগস্ট মুসলমানদের উপর আক্রমণ করল হিন্দুরা। কিছু এলাকায় মুসলমানরাও আক্রমণ করল হিন্দুদের। ব্যস, শুরু হয়ে গেল দাঙ্গা। হিন্দু এলাকার মুসলমানরা রক্ষা পেল না। আবার মুসলমান এলাকার হিন্দুদেরও রেহাই মিলল না। কাউকে অসহায় অবস্থায় পেলেই হলো। দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সবাই। হিন্দুরা মুসলমানদের উপর। মুসলমানরা হিন্দুদের উপর। কলকাতা শহরে মানুষের লাশ পড়ে আছে এখানে ওখানে। মহল্লার পর মহল্লা আগুনে পুড়ে গেছে। মুসলমানদের জন্য মুসলিম এলাকায় আর হিন্দুদের জন্য হিন্দু এলাকায় ক্যাম্প খোলা হয়েছে। দাঙ্গা বন্ধ করার ও আহতদের সেবা করার কাজ করে যাচ্ছেন মুজিব। আবার যাদের আশ্রয় দিয়েছেন বিভিন্ন ক্যাম্পে, তাদের জন্য রসদও জোগাড় করতে হচ্ছে। বেকার হোস্টেলে অনেক মুসলমানকে আশ্রয় দিয়েছেন। বাড়তি মানুষের চাপে হোস্টেলগুলোয় চাল, আটা ফুরিয়ে গেছে খুব দ্রুত। ওদিকে দোকানপাট বন্ধ। লুট হবার ভয়ে কেউ দোকানও খুলছে না। উপায় না পেয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে গেলেন মুজিব। শহীদ সাহেব তাঁকে পাঠালেন নবাবজাদা নসরুল্লাহর কাছে। নসরুল্লাহ ছিলেন ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহর ছোট ভাই। খুব অমায়িক। ডেপুটি চিফ হুইপ ছিলেন। শহীদ সাহেব তাঁকে এ কাজের ভার দিয়েছেন। নসরুল্লাহ তাঁকে নিয়ে গেলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। বললেন, 'চাউল এখানে রাখা হয়েছে। তোমরা নেবার বন্দোবস্ত করো। আমাদের কাছে গাড়ি নাই। সমস্ত গাড়ি মিলিটারি নিয়ে গেছে।'

চাল নেয়ার জন্য ঠেলাগাড়ি আনলেন শেখ মুজিব। কিন্তু ঠেলবে কে? গাড়ি ঠেলারও লোক নেই। শেষে মুজিব, নূরুদ্দিন ও নূরুল হুদা—এই তিনজন চাল বোঝাই ঠেলাগাড়ি ঠেলতে লাগলেন। বেকার হোস্টেল, ইলিয়ট হোস্টেলে চাল পৌঁছে দিলেন।

কিছুদিনের মধ্যে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল পুরো বাংলায়। এসময় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে পুরো বাংলা ঘুরে বেড়িয়েছেন মুজিব। এবং দেড়মাস

পর হাড্ডিসার হয়ে কলকাতায় ফিরলেন। কিছুতেই জ্বর ছাড়ছিল না। চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হয়ে আবার বেকার হোস্টেলে এলেন। ওদিকে বিএ পরীক্ষার বেশি দেরি নেই। কিন্তু কলেজ থেকে পরীক্ষা দিতে দেবে কি-না ঠিক নেই। প্রিন্সিপাল জুবেরীর সঙ্গে দেখা করলেন মুজিব। প্রিন্সিপাল বললেন, 'তুমি যথেষ্ট কাজ করেছ পাকিস্তান অর্জনের জন্য। তোমাকে বাধা দিতে চাই না। তুমি যদি ওয়াদা করো যে এই কয়েক মাস লেখাপড়া করবা এবং কলকাতা ছেড়ে বাইরে কোথাও চলে যাবা এবং ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে এসে পরীক্ষা দিবা, তাহলে তোমাকে আমি অনুমতি দিব।'

ততদিনে টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে। প্রফেসর তাহের জামিল, প্রফেসর সাইদুর রহমান ও প্রফেসর নাজির আহমদের সামনে ওয়াদা করলেন মুজিব। সব বইপত্র নিয়ে চলে গেলেন বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী শেখ শাহাদাত হোসেনের কাছে। দু মাস ওখানে থেকে পরীক্ষার কিছুদিন আগে কলকাতায় ফিরে এলেন। কলকাতায় এসে উঠলেন পার্ক সার্কাসে ছোটবোনের বাসায়। এরপর বিএ পরীক্ষা দিয়ে পাস করলেন।

বিএ পরীক্ষার পর আবার রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মুজিব। ভারতের রাজনীতি তখন জটিল এক পরিস্থিতিতে। ব্রিটিশরা ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাইছে। যত দ্রুত সম্ভব। এজন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়েছিল। কংগ্রেস ওই সরকারে যোগ দেয়। মুসলিম লীগ যোগ দেয়নি। তবে মুসলিম লীগের জন্য পাঁচটা মন্ত্রীর পদ রেখে দিয়েছিল ব্রিটিশরা। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ যোগ দেয়। কারণ মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ না দিলে কংগ্রেস কিছুতেই পাকিস্তান দাবি মানতে চাইত না। মন্ত্রী হন লিয়াকত আলী খান, আই আই চুন্দ্রিগড়, আবদুর রব নিশতার, রাজা গজনফর আলী খান এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

১৯৪৭ সালের জুন মাসে ভারত ভাগের ঘোষণা দিল ব্রিটিশরা। বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব ভাগ হবে বলে রাজি হয় কংগ্রেস। আসামের সিলেট জেলা ছাড়া আর কিছুই পাকিস্তানে আসবে না। বাংলাদেশের কলকাতা ও তার আশপাশের জেলাগুলোও ভারতে থাকবে। মাওলানা আকরম খাঁ ও মুসলিম লীগ নেতারা এই ভাগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। বাংলাদেশ ভাগ করার জন্য জনমত সৃষ্টি করতে লাগল কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা। মুজিবরাও তখন বাংলাদেশ ভাগ হতে না দেয়ার জন্য

বদ্ধপরিকর। নানান জায়গায় সভা করতে লাগলেন তাঁরা। কলকাতার মুসলমানরা তো প্রস্তুতি নিয়েই ছিলেন, যা হওয়ার হবে, কলকাতা ছাড়া হবে না। বাংলাদেশের রাজধানী কলকাতা করার জন্যও প্রস্তুত ছিল বাংলাদেশের মুসলিম লীগ। কিন্তু কর্মী হিসেবে মুজিবরা তখনও জানতেন না দিল্লিতে বসেই মুসলিম লীগের শীর্ষ নেতারা কলকাতাকে আগেই ছেড়ে দিয়েছে। ভারতের বড়লাট মাউন্টব্যাটেন কিন্তু সবদিক সামলে চলছিলেন।

বাংলার মুসলিম লীগে তখন দুটো গ্রুপ। একটা গ্রুপ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর, আরেকটা খাজা নাজিমুদ্দীনের। সুযোগসন্ধানী, সুবিধাভোগী, স্বার্থপর নেতারা খাজা নাজিমুদ্দীনের গ্রুপে। শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীর গ্রুপে। মুসলিম লীগের নেতা হয়ে খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকাকে রাজধানী ঘোষণা করে বসলেন এবং দলবল নিয়ে ঢাকায় চলেও গেলেন। ওদিকে পশ্চিম বাংলার হতভাগা মুসলমানদের কথা ভাবলেন না। কিন্তু কলকাতার কী হবে? কলকাতায় তো হিন্দু-মুসলিম সমান সমান। কলকাতা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন ভারতের গভর্নর লর্ড মাউন্টব্যাটেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের লেখা 'মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন' বইতে বিষয়টা বিস্তারিত আছে। তখনও সিদ্ধান্ত হয়নি কলকাতা পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে নাকি হিন্দুস্থানের সঙ্গে থাকবে। যদি সিদ্ধান্ত না হয়, তাহলে কলকাতাকে 'ফ্রি শহর' করা নিয়েও ভাবনা চলছিল। এর কারণও আছে। কলকাতা ছাড় না দেয়ার অঙ্গীকার নিয়েছে দুই ধর্মের মানুষই। যে কোনো সময় এ নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে যেতে পারে। কলকাতা যদি হিন্দুস্থানে পড়েও, তবু শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত পাকিস্তানে আসার সম্ভাবনা ছিল। হিন্দুরা কলকাতা পাওয়ার জন্য আরো অনেক কিছু ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিল। নেতাদের ভুল নেতৃত্ব ও ভুল সিদ্ধান্তের খেসারত জনগণকেই দিতে হয়। যেমন দিতে হয়েছিল পূর্ব বাংলার মানুষকে। পূর্ব বাংলার টাকায় সমৃদ্ধ হয়েছিল কলকাতা। অথচ পাকিস্তানের লোভী নেতাদের কারণে কলকাতা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। কলকাতা যদি পাকিস্তানে থাকত, তাহলে পাকিস্তানের রাজধানী না করে উপায় ছিল না। কারণ জনসংখ্যা দিক দিয়ে পূর্ববাংলা ছিল এগিয়ে। অন্যদিকে শহর হিসেবে তখনকার পুরো ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শহরও ছিল কলকাতা। কলকাতা রাজধানী হলে অসুবিধা হতো পশ্চিম পাকিস্তানিদের। ক্ষমতা

কুক্ষিগত করতে পারত না। সে কারণে কলকাতা ছেড়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করে সফল হয়েছিল তারা।

দেশ ভাগ হয়ে গেল। দলের সিদ্ধান্ত মেনে ঢাকা চলে এলেন মুজিব। পাকিস্তান তো হয়েছে। স্বপ্নের পাকিস্তান। মুসলমানদের পাকিস্তান। আর চিন্তা কিসের? স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে বাঁচা যাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হলেন মুজিব। মোগলটুলীতে মুসলিম লীগের অফিসও খোলা হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে প্রতিষ্ঠা করা হলো 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ'। ব্যাপক সাড়া পড়ে গেল ছাত্রদের মধ্যে। এক মাসের মধ্যে সকল জেলাতেই কমিটি করে ফেললেন।

ওদিকে পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান। ১৯৪৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। করাচিতে পাকিস্তান সংবিধানসভার বৈঠক চলছিল। ওই বৈঠকে আলোচনা হচ্ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে। মুসলিম লীগ নেতারা উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে। পূর্ব পাকিস্তানের বেশিরভাগ লীগ সদস্যেরও একই মত। দ্বিমত করলেন

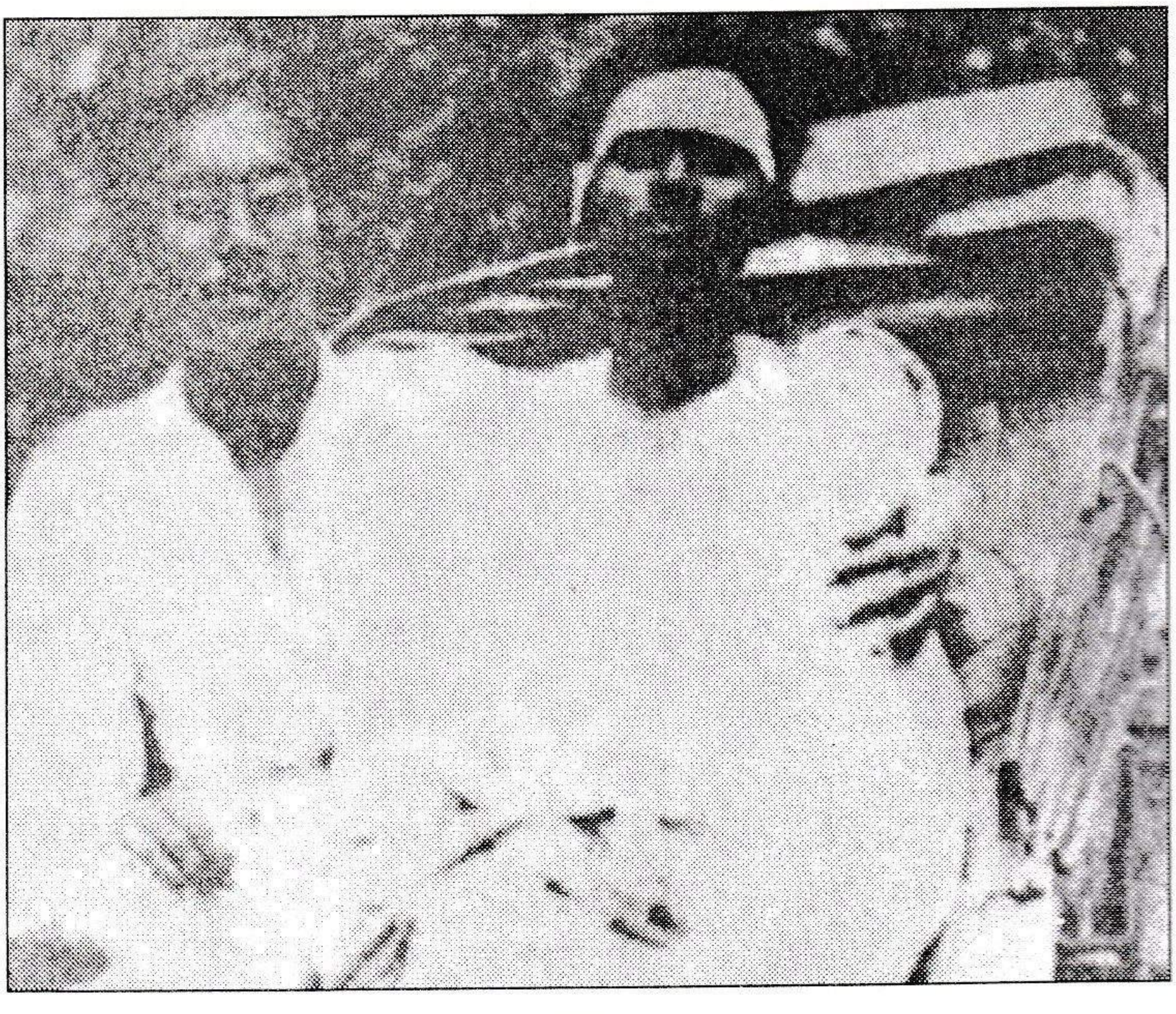

কুমিল্লার কংগ্রেস সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানালেন তিনি। তাঁর যুক্তি ছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু মানুষের ভাষা বাংলা। কিন্তু মুসলিম লীগ নেতারা কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। বাংলা ভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেলেন শেখ মুজিব। প্রতিবাদ জানাল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস। তাদের দাবি বাংলা ও উর্দু দুই ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা হোক। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিস যুক্তভাবে গঠন করল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ'। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ 'বাংলা ভাষা দাবি' দিবস ঘোষণা করা হলো। জেলায় জেলায় কাজ শুরু হলো। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিল।

১১ মার্চ ভোর থেকে শুরু হলো পিকেটিং। পুরো ঢাকা শহর পোস্টারে ভরে গেল। দোকানপাট বন্ধ ছিল। শত শত ছাত্রকর্মী নানান জায়গায় পিকেটিং শুরু করল। বিভিন্ন জায়গায় ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ শুরু হয়ে গেল। অনেকে আহত হলেন। শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করার জন্য জিপ নিয়ে তাড়া করছে সিটি এসপি। কিন্তু সাইকেল নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন মুজিব। ইডেন বিল্ডিংয়ের কাছে এসে ধরা পড়লেন। আরো কিছু ছাত্রসহ লাঠিচার্জের শিকার হলেন। এবং পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে জিপে তুলল। কিছু ছাত্রকে গাড়ি করে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে এল পুলিশ। সত্তর-পঁচাত্তরজনকে বেঁধে পাঠিয়ে দিল জেলে। এদের মধ্যে শেখ মুজিবও ছিলেন। দানা বেঁধে উঠল আন্দোলন। ঢাকার মানুষের সমর্থনও পেলেন তাঁরা।

জেলে চার নম্বর ওয়ার্ডে রাখা হলো বন্দিদের। তিনতলা দালান। তাঁরা বন্দি ছিলেন পাঁচ দিন। দেয়ালের বাইরেই মুসলিম গার্লস স্কুল। ওই পাঁচদিনই সকাল দশটায় স্কুলের ছাদে উঠত স্কুলের মেয়েরা। আর স্লোগান দিত—রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই। পুলিশি জুলুম চলবে না।

বিকেল চারটা পর্যন্ত টানা স্লোগান দিয়ে যেত ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা। একটুও ক্লান্ত হতো না। দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন মুজিব। তাঁর সহবন্দি শামসুল হককে বলতেন, 'হক সাহেব ঐ দেখুন, আমাদের বোনেরা বেরিয়ে এসেছে। আর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে পারবে না।'

তাঁর কথা সমর্থন দিয়ে শামসুল হক বলতেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, মুজিব।'

মার্চের ১১ তারিখ জেলে নেয়া হয় শেখ মুজিবসহ ভাষা আন্দোলনকারীদের। মুক্তি দেয়া হয় ১৫ তারিখ সন্ধ্যায়। জেলে অনেক ছোট ছোট স্কুলছাত্রও ছিল। জেলের ভিতর এই খুদে ভাষাসৈনিকদের বুঝিয়ে শুনিয়ে রাখতেন শেখ মুজিব, শামসুল হক ও মান্নান সাহেব। বন্দিদের মধ্যে একজন ছিল একেবারে খুদে। বয়স নয় কি দশ বছর। ছেলেটার বাবা এসেছিল জেলগেটে। ছেলের সঙ্গে দেখা করে তার বাবা বলেছিলেন, 'তোকে আজই বের করে নিব।'

ছেলেটা বলেছিল, 'অন্য ছাত্রদের না ছাড়লে আমি যাব না।'

ছেলেটির অমন সাহসিকতার কথা শুনে সবাই তাকে আদর করতে লাগল। বয়সে সবার ছোট হওয়া সত্ত্বেও সবাই তার নামে জিন্দাবাদ দিল। ভীষণ শক্ত ছেলে ছিল সে। এ থেকেই বোঝা যায় গ্রেফতারকৃত কোনো ছাত্রেরই মনোবল নষ্ট হয়নি। বরং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতেও তারা প্রস্তুত ছিল।

১৫ তারিখ সন্ধ্যায় জেল থেকে মুক্তি পেলেন শেখ মুজিব। ১৬ তারিখ সকাল দশটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রসভা ছিল। সেখানেও যোগ দিলেন। হঠাৎ কে যেন তাঁর নাম প্রস্তাব করল সভাপতি হিসেবে। আর সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সেটা সমর্থন করলেন। বিখ্যাত আমতলায় সেটাই ছিল কোনো সভায় শেখ মুজিবের প্রথম সভাপতিত্ব করা।

ভাষা আন্দোলনের সময় মুসলিম লীগ সরকার থেকে একটা গুজব ছড়ানো হয়। কলকাতা থেকে হিন্দু ছাত্ররা পায়জামা পরে এসে এই আন্দোলন করেছে। যারা ভাষা আন্দোলন করছে তারা যুক্তবাংলা ও ভারতের দালাল। তারা রাষ্ট্রদ্রোহী। সবই ছিল সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপকৌশল। কারণ আন্দোলন করতে গিয়ে যে সত্তর-পঁচাত্তর জন ছাত্র বন্দি হয়েছিল, তাদের একজনও হিন্দু ছিল না।

মুসলিম লীগের অপচেষ্টা সফল হয়নি। এবার তারা অন্য চেষ্টা করতে লাগল। মানুষকে বোঝাতে লাগল যে উর্দু ইসলামিক ভাষা।

দুনিয়ার নানান দেশে মুসলমান আছে। তারা তাদের নিজেদের ভাষায় কথা বলে। পারস্যের লোকেরা ফার্সি, তুরস্কের লোকেরা তুর্কি,

ইন্দোনেশিয়ার মানুষ ইন্দোনেশিয়ান, মালয়েশিয়ার লোকেরা মালয়, এমন কি চীনের মুসলমানরাও চীনা ভাষায় কথা বলে। শুধু তাই নয়, যে উর্দুকে তারা রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল, সেই উর্দুটাও পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের ভাষা নয়। পাঞ্জাবের লোকেরা পাঞ্জাবি, সিন্ধুর মানুষ সিন্ধি, সীমান্ত প্রদেশের মানুষ পশতু আর বেলুচিস্তানের মানুষ বেলুচ ভাষায় কথা বলে। এখানে উর্দু কি করে ইসলামিক ভাষা হলো, সেটা আর বোঝাতে পারল না মুসলিম লীগ সরকার। পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মভীরু মুসলমানদের ইসলামের দোহাই দিয়ে ধোঁকা দিতে তারা ব্যর্থ হলো। মাতৃভাষার অপমান কোনো জাতি সইতে পারে না। যে কোনো জাতির কাছে তার মাতৃভাষা প্রিয়। এর উপর আঘাত এলে কেউ চুপ করে থাকবে না। বাঙালিরাও সেদিন চুপ করে থাকেনি।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য আন্দোলন কেবল ঢাকায় নয়, ঢাকার বাইরেও হয়েছিল। ফরিদপুর ও যশোরে কয়েকশো ছাত্র গ্রেফতার হয়েছিল। রাজশাহী, খুলনা, দিনাজপুরসহ বেশ কিছু জেলায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ এই আন্দোলন বানচাল করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। এই ছাত্রসংগঠনটি সরকারের তোষামদ করত। ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করলেও এর সঙ্গে সাধারণ মানুষও জড়িয়ে পড়েছিল। সরকারি কর্মচারীরাও এই আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছিলেন। মার্চে ঢাকা এসে জিন্নাহও ঘোষণা করলেন 'উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' ওই সভায় মুজিবসহ চার-পাঁচশো ছাত্র এক জায়গায় ছিলেন। অনেকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে জানিয়েছিলেন, মানি না। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বক্তৃতা করতে গিয়ে আবারও জিন্নাহ বললেন, 'উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।' ছাত্ররা তাঁর সামনেই বসে চিৎকার করে বলেছিল, 'না, না, না।'

প্রায় পাঁচ মিনিট চুপ করে ছিলেন জিন্নাহ। মুখের উপর তাঁর কথার প্রতিবাদ করেছিল ছাত্ররা। বেশ থাক্কা খেয়েছিলেন জিন্নাহ। জিন্নাহ চলে যাওয়ার কয়েকদিন পর ফজলুল হক হলে ছাত্রদের এক সভা হয়। ওই সভায় মুজিব বলেন, 'বাংলা ভাষা শতকরা ছাপ্পান্নজন লোকের মাতৃভাষা, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সংখ্যাগুরুদের দাবি মানতেই হবে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। তাতে যাই হোক না কেন, আমরা প্রস্তুত আছি।'

সাধারণ ছাত্ররা মুজিবকে সমর্থন করলেন। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও যুবকরা ভাষার দাবি নিয়ে সভা ও শোভাযাত্রা করতে থাকলেন। দিন দিন জনমত সৃষ্টি হতে লাগল।

ভাষা আন্দোলনসহ আরো কিছু বিষয় নিয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে গেল মুজিবের। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় তখন মুসলিম লীগ। কিন্তু মুজিবের মতো পূর্ব পাকিস্তানের নিঃস্বার্থ কর্মীদের নানান হয়রানি করতে লাগল সরকার। এর মধ্যে দেশের এই চরম বিপদের সময় কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করলেন মুজিব। টাঙ্গাইলে মুসলিম লীগ কর্মীদের সভা ডাকা হলো। ওখানে আলোচনার পর ঠিক হলো নারায়ণগঞ্জে আরেকটা সভা হবে। পুলিশ ও সরকারের পেটোয়া বাহিনীর বাধার পরেও সভা হলো। সভাপতিত্ব করেছিলেন মওলানা ভাসানী।

দিন দিন মুসলিম লীগের দুঃশাসনে মানুষ অস্থির হয়ে উঠছিল। কয়েক জেলায় খাদ্যসমস্যাও দেখা দিল।

তখন ফরিদপুর ও ঢাকা জেলার লোক ধান কাটার জন্য খুলনা ও বরিশাল যেত। ধান কাটার মওসুমে দল বেঁধে দিনমজুর হিসেবে জেলায় জেলায় কাজ করত। ধান কেটে জমির মালিকের ঘরে উঠিয়ে দিয়ে আসত। বিনিময়ে একটা অংশ পেত। এই ধান কাটিয়ে শ্রমিকদের বলা হতো দাওয়াল। হাজার হাজার নৌকায় করে দাওয়ালরা যেত। কুমিল্লার দাওয়ালরা যেত সিলেট অঞ্চলে। প্রায় দু মাসের জন্য বাড়ি ছেড়ে দূরের জেলায় যেতে হতো। তাই যাওয়ার সময় মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার করে দিয়ে যেত সংসার খরচের জন্য। ফিরে এসে শোধ করত। ওদিকে অনেক দাওয়ালের আবার নৌকা ছিল না। তারাও নৌকা ধার করে নিয়ে যেত। ফিরে এসে নৌকার মালিকদেরও লাভের একটা অংশ দিতে হতো। ফরিদপুর, ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার হাজার হাজার মানুষ এই ধানের উপর নির্ভর করত। তো সেবার দাওয়ালরা ধান কাটতে গেল। দু মাস খাটাখাটনির পর ধান কাটা শেষ। সরকার বাধা দিল না। নিজেদের পাওনা বুঝে নিয়ে নৌকা বোঝাই করে বাড়ির দিকে রওনা দিল দাওয়ালরা। অমনি সরকারের কর্ডন প্রথার আইনে চেপে ধরা হলো দাওয়ালদের। কর্ডন প্রথার আইনে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় কোনো খাদ্য যেতে দেয়া হতো না। তাদের বলা হলো—ধান নিতে পারবে না,

সরকারের হুকুম। ধান জমা দিয়ে যেতে হবে নয়তো নৌকাসহ আটক করা হবে।

বহু বছরের রীতি ছিল এটা। তাছাড়া দাওয়ালদের বাড়ির মানুষ পথ চেয়ে বসে আছে, পেটভরে ভাত খাবে এই আশায়। দাওয়ালরা সহজে ধান দিতে চাইল না। কিন্তু জোর করে সমস্ত লোকের ধান কেড়ে নেয়া হলো। খবর পেয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন মুজিব। এর বিরুদ্ধে সভা করলেন। সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে দেখাও করলেন। কিন্তু কোনো ফল হলো না। এই দিনমজুরদের দু মাসের শ্রম বিফলে গেল। মহাজনদের কাছ থেকে যে টাকা ধার করেছিল, দেনার দায়ে ভিটেবাড়ি খোয়াতে হলো অনেকের।

খুলনা ছুটে গেলেন মুজিব। ফরিদপুরের দাওয়ালদের প্রায় দুশো নৌকা আটকে ছিল খুলনায়। রাতের অন্ধকারে দাওয়ালরা সরকারি হুকুম না মেনে ধান নিয়ে নৌকা ছেড়ে দিল। দশ-পনের মাইল পর লঞ্চ দিয়ে পুলিশ তাদের ধাওয়া করল। বাধা দিয়েও কিছু করতে পারেনি দাওয়ালরা। জোর করে তাদের ধান নামান হলো নদীর পাড়ের এক মাঠে। এবং সবাইকে তাড়িয়ে দিয়েছিল পুলিশ। সরকারি গুদামে সে ধান ওঠেনি। পরের দিন প্রচুর বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিতে ধান ভেসে যায়। খুলনা এসে মুজিব দেখলেন তখনও অনেক নৌকা আটকে আছে ধানসহ। দাওয়ালদের নিয়ে সভা করলেন মুজিব। শোভাযাত্রাসহ গেলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ি। তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মুনীর চৌধুরীর বাবা আবদুল হালিম চৌধুরী। মুজিবের সঙ্গে আলাপ করে ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, তাঁর কিছুই করার নেই। সরকারের হুকুম। তবে ওয়াদা করলেন সবকিছু জানিয়ে সরকারের কাছে টেলিগ্রাম করবেন।

দাওয়ালদের নিয়ে ফিরে এলেন মুজিব। এবং নিজেও সরকারের উচ্চপর্যায়ে টেলিগ্রাম করলেন।

জিন্নাহ ফান্ড নামে আরেকটা অত্যাচার শুরু হয়েছিল তখন। সরকার এই ফান্ড খোলে। নিয়ম ছিল যে যা পারে তাই দান করবে। যাদের অর্থ ছিল তারা দান করেছে। অনেক গরিবও টাকা দিয়েছে ফান্ডে। কিন্তু কিছু অফিসার সরকারকে খুশি করার জন্য জোরজুলুম করে টাকা তুলতে শুরু করেছিল। শুরু হয়ে গিয়েছিল টাকা তোলার প্রতিযোগিতা। যে মহকুমা অফিসার বেশি তুলতে পারবেন, তিনি ভেবেছেন তাড়াতাড়ি প্রমোশন পাবেন।

গোপালগঞ্জ মহকুমায় এটা ভীষণ আকার ধারণ করেছিল। জিন্নাহ মারা যাওয়ার পর পাকিস্তানের বড়লাট হয়েছেন খাজা নাজিমুদ্দিন। তিনি গোপালগঞ্জ আসবেন। মহকুমা হাকিম সভা করে অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করেছেন। সেখানেই ঠিক হয় মহকুমার ছয় লাখ মানুষ প্রত্যেককে এক টাকা করে দিতে হবে। তাতে ছয় লাখ টাকা উঠবে। যাদের বন্দুক আছে, তাদের আলাদাভাবে দিতে হবে। আর ব্যবসায়ীদের তো কথাই নেই। বড় নৌকাপ্রতিও দিতে হবে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টদের নির্দেশ দেয়া ছিল, না দিলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। শুরু হলো জুলুম। চৌকিদার, দফাদাররা নেমে পড়েছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে গরু, বদনা, থালা, ঘটিবাটি কেড়ে আনা শুরু হলো। খুলনা থেকে গোপালগঞ্জ ছুটলেন মুজিব। নৌকায় করে যাচ্ছেন। নৌকার মাঝি তাঁকে চিনতেন। নৌকা ছাড়ার পর মাঝি বললেন, 'ভাইজান আপনি এখন এসেছেন। আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। পাঁচজন লোক আমরা, হুকুম এসেছে পাঁচ টাকা দিতে হবে। দিনভর কোনোদিন দুই টাকা, কোনোদিন আরও কম উপার্জন করি। বলেন তো পাঁচ টাকা কোথায় পাই? গতকাল আমার বাবার আমলের একটা পিতলা বদনা ছিল, টাকার দায়ে চৌকিদার সেটা নিয়ে গেছে।'

বলেই কেঁদে ফেললেন মাঝি। শেষে বললেন, 'পাকিস্তানের কথা তো আপনার কাছ থেকেই শুনেছিলাম, এই পাকিস্তান আনলেন!'

গোপালগঞ্জ পৌঁছার সাথে সাথে অনেক মানুষ জড়ো হলো। নানা পেশার মানুষ। সবাইকে নিয়ে আলোচনা করে মুজিব বললেন, 'আমাদের বাধা দিতে হবে। কারণ এটা সরকারের ট্যাক্স না।'

ততদিনে তিন লাখ টাকার মতো তোলা হয়ে গেছে। এখান থেকে খাজা সাহেবকে অভ্যর্থনা দেয়ার খরচ বাদ দিয়ে বাকি টাকা দেয়া হবে জিন্নাহ ফান্ডের জন্য। সম্ভব হলে মসজিদের জন্য কিছু টাকা রাখা হবে। সভায় সিদ্ধান্ত হয়ে গেল, এ টাকা নিতে দেয়া হবে না। অভ্যর্থনায় যা ব্যয় হয়, বাকিটা মসজিদ আর গোপালগঞ্জে কলেজ করার জন্য রেখে দেয়া হবে। ব্যতিক্রম হলে বাধা দেয়া হবে। দরকার হলে সভায় গোলমাল করা হবে।

এ খবর চলে গেল পুরো মহকুমায়। টাকা তোলা বন্ধ হয়ে গেল। মুজিব পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সবার সাহস বেড়ে গেল।

খাজা আসার দুদিন আগে মহকুমার হাকিম পরামর্শ করলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। মুজিবকে গ্রেফতার করা যায় কি-না অনুমতি চাইলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিষেধ করে দিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন গোলাম কবির। কলকাতা থেকে মুজিবের পরিচিত ছিলেন। মুজিবকে তুমি বলে সম্বোধন করতেন। মুজিবও তাঁকে কবির ভাই বলতেন। কবির সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে মুজিব বললেন, 'অত্যাচার করে টাকা তোলার ব্যাপারে তদন্ত করতে হবে এবং দোষীকে শাস্তি দিতে হবে। আর তুলে ফেলা টাকা খাজা সাহেবকে দেয়া হবে ঠিকই, তবে টাকাটা তিনি কলেজ করার জন্য দিয়ে দেবেন।'

পরদিন সকালে খাজা নাজিমুদ্দিনের বজরা এলো গোপালগঞ্জে। মুজিবকে বজরায় ডেকে নেয়া হলো। খাজা সাহেবের পক্ষ হয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আলোচনা করলেন মুজিবের সঙ্গে। পাশের রুমে অবশ্য খাজা সাহেব ছিলেন। এবং শেষপর্যন্ত জিন্নাহ ফান্ডের জন্য তোলা টাকা কলেজ করার জন্য দিয়ে যান খাজা সাহেব।

১৯৪৯ সাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্ন-বেতনভোগী কর্মচারীরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। তাদের চাকরির নিশ্চয়তা ছিল না। এছাড়া নানান সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছিল। মুজিব তাদের বলেছিলেন, 'প্রথমে সংঘবদ্ধ হন, তারপর দাবিদাওয়া পেশ করেন। নইলে কতৃপক্ষ মানবে না।' তারা ইউনিয়ন করে দাবি পেশ করেছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি মানল না। কয়েকজন ছাত্রনেতাকে নিয়ে ভাইস-চ্যান্সেলরের সঙ্গে দেখা করলেন মুজিব। সব বুঝিয়ে বললেন। ওদিকে সকল কর্মচারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অনেক আলোচনার পর ভাইস-চ্যান্সেলর বললেন, 'আগামীদিন ধর্মঘট প্রত্যাহার করে কাজে যোগ দিলে কাউকে কিছু বলা হবে না। এবং কর্তৃপক্ষের কাছে ওদের ন্যায্য দাবি মানানোর চেষ্টা করা হবে।'

তাঁর কথায় বিশ্বাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এলেন মুজিব। তখন বেলা তিনটা বেজে গিয়েছিল। কর্মচারীদের প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ করে মুজিব ঘোষণা দিলেন কাল থেকে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হবে। অনেক কর্মচারী দূরে থাকে। যতটা সম্ভব তাদের খবর দেয়া হলো। পরদিন ছাত্ররা

ক্লাসে যোগদান করেছে, অনেক কর্মচারীও কাজে যোগ দিলেন। শতকরা পঞ্চাশজন কর্মচারী দূর থেকে এসে বারোটার আগে কাজে যোগ দিতে পারেনি। তাদের যোগদান করতে দেয়া হয়নি। সবাইকে নিয়ে আবার ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে ছুটলেন মুজিব। কিন্তু তিনি বললেন 'এগারোটার পরে যারা যোগ দেবে তাদের নেয়া হবে না।' মুজিব বোঝাতে চাইলেন, 'দু-এক ঘণ্টার জন্য গোলমাল কেন করলেন? আপনি তো আগেই বলতে পারতেন এগারোটার মধ্যে যোগ দিতে হবে।'

কোনো যুক্তি মানতে চাইলেন না ভাইস চ্যান্সেলর। আবার ধর্মঘট শুরু হলো। ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করল। মুজিব ঘোষণা দিলেন দাবি না-মানা পর্যন্ত ধর্মঘট চলতেই থাকবে। ধর্মঘটের মধ্যে দলীয় কাজে দিনাজপুর গিয়েছিলেন মুজিব। ওখান থেকে ফেরার সময় খবরের কাগজে দেখলেন তাঁকেসহ সাতাশজন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বহিষ্কারাদেশের বিরুদ্ধে ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ির সামনে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করলেন মুজিব এবং গ্রেফতার হলেন। এর মধ্যেই ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা হলো। দলের নাম দেয়া হলো 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'। মুসলিম লীগের অনেক পুরনো নেতা এই দলে যোগ দিলেন। দলের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক। শেখ মুজিব জয়েন্ট সেক্রেটারি। দল গঠনের কিছুদিন পরেই মুক্তি পেলেন মুজিব। মুক্তির পর জেলগেটে পেলেন বিপুল সম্বর্ধনা।

ঢাকায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের জনসভা হবে। মওলানা ভাসানী এসেছেন ঢাকায়। কিন্তু জনসভা বানচাল করে দিয়েছিলেন বাদশা মিয়া। মাইক্রোফোন নষ্ট করে প্যান্ডেল ভেঙে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আরমানিটোলার বাবুবাজারের মানুষ। বাদামতলীর ভালো বংশের ছেলে। খারাপ সঙ্গে পড়ে বিগড়ে গিয়েছিলেন। ঢাকার হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। অনেক মামলার আসামি। সভা ভন্ডুল করে দিয়ে বাদশা মিয়া চলে গেলেন। তার কাছে গেলেন একই মহল্লার আরেক বাসিন্দা আরিফুর রহমান চৌধুরী। সবার সঙ্গেই অমায়িক ব্যবহার করতেন চৌধুরী সাহেব। খেলাফত আন্দোলন

থেকে রাজনীতি করছেন। দেশের রাজনীতি করতে গিয়ে নিজের সবটুকু বিলিয়ে দিয়েছেন। বরিশালের উলানিয়া জমিদারি বংশে জন্ম। বাদশা মিয়াকে বললেন আরিফুর রহমান, 'বাদশা মিয়া, আমাদের সভা একবার ভেঙে দিয়েছেন। আমরা আবার সবকিছু ঠিক করে সভা আরম্ভ করছি। আপনি আমাদের কথা প্রথমে শুনুন, যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বলি বা দেশের বিরুদ্ধে বলি তারপরে সভা ভাঙতে পারবেন।'

দলবল নিয়ে আবার সভার কাছে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলেন বাদশা মিয়া। কয়েকজন বক্তৃতা করার পরে বাদশা মিয়া প্লাটফর্মের কাছে এসে বললেন, 'আমার কথা আছে, আমাকে বলতে দিতে হবে।'

বাদশা মিয়াকে কথা বলতে বাধা দেয়ার কেউ নেই। আরমানিটোলা ময়দান তার রাজত্বের মধ্যে। মাইকের কাছে গিয়ে বাদশা মিয়া বললেন, 'আমাকে মুসলিম লীগ নেতারা ভুল বুঝিয়েছিল আপনাদের বিরুদ্ধে। আপনাদের সভা ভাঙতে আমাকে পাঁচশত টাকা দিয়েছিল, এ টাকা এখনও আমার পকেটে আছে। আমার পক্ষে এ টাকা গ্রহণ করা হারাম। আমি এ টাকা আপনাদের সামনে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছি।'

বলেই টাকাগুলি (পাঁচ টাকার নোট) ছুড়ে দিলেন। তারপর বাদশা মিয়া বললেন, 'আজ থেকে আমি আওয়ামী মুসলিম লীগের সভ্য হলাম, দেখি আরমানিটোলায় কে আপনাদের সভা ভাঙতে পারে?'

উপস্থিত জনসাধারণ বাদশা মিয়ার গলায় মালা পরিয়ে দিল। আর জনগণের কাছে ফাঁস হয়ে গেল মুসলিম লীগের অপকর্ম।

এরপর শুরু হলো অন্যরকম অত্যাচার। যেখানেই আওয়ামী মুসলিম লীগ সমাবেশ করতে যায়, সেখানেই ১৪৪ ধারা জারি করে পুলিশ। আবারও গ্রেফতার করার জন্য মুজিবকে খুঁজতে থাকে পুলিশ। কিন্তু মওলানা ভাসানী বলে দিয়েছেন মুজিবকে, গ্রেফতার হওয়া যাবে না। বরং আরো কঠিন একটা কাজ দিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে। কোনো কিছুতেই ভয় পান না মুজিব। তিনি পশ্চিম পাকিস্তান ছুটলেন। মামা জাফর সাদেকের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিলেন। ইত্তেহাদ পত্রিকায় কিছু পাওনা ছিল। সেখান থেকে সামান্য কিছু টাকা নিয়ে রওনা দিলেন লাহোর। তারপর অনেক কষ্টে লাহোর পৌঁছলেন। পূর্ব বাংলার পুলিশকে অনেক কষ্টে ফাঁকি দিতে হয়েছিল।

মুজিবকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছে তারা। তাঁর জন্য অনেকের বাড়িতে তল্লাশিও হয়েছে।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করলেন। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা জানালেন তাঁকে। এবার ফেরার পালা। কিন্তু সরাসরি বিমানে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আসা সম্ভব নয়। বিমানবন্দরেই পুলিশ তাঁর অপেক্ষায় থাকবে। যদিও গ্রেফতার নিয়ে তাঁর মধ্যে কখনো আতঙ্ক ছিল না। তিনি জানেন, রাজনীতি করতে গেলে প্রেফতারে ভয় পেলে চলে না। তাছাড়া ভিতুরাই লুকিয়ে থাকে, আর সাহসীরা বুক চিতিয়ে দেয়। তবে এবার ব্যাপারটা ভিন্ন। ধরা তিনি ঠিকই দেবেন, এখন নয়। তার আগে বেশকিছু কাজ জমে আছে। সেগুলো সারতে হবে।

লাহোর থেকে বিমানে দিল্লি আসতেও কম ঝক্কি পোহাতে হয়নি তাঁকে। ভারতে ঢোকার পারমিট পেয়েছেন। তবে পারমিটে লেখা রয়েছে তিন দিনের বেশি ভারতে থাকতে পারবেন না। তিনিও হিসাব করে দেখলেন তিন দিনের মধ্যেই পূর্ব বাংলায় ঢুকতে পারবেন। তাঁকে বিমানে তুলে দেয়ার জন্য নবাবজাদা জুলফিকারকে পাঠিয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দী সাহেব। সোহরাওয়ার্দী সাহেব খবর পেয়ে গিয়েছিলেন, এয়ারপোর্টে তাঁকে প্রেফতার করা হতে পারে। আর তাঁকে গ্রেফতার করার সঙ্গে সঙ্গে যাতে সোহরাওয়ার্দী সাহেব খবর পেয়ে যান, সেজন্যই জুলফিকারকে পাঠিয়েছিলেন।

ওরিয়েন্ট এয়ারওয়েজের বিমানে যাবেন তিনি। এয়ারপোর্টে পৌছলেন। তাঁর মালপত্র আলাদা করে রাখল এয়ারপোর্টের কর্মীরা। আর একজন কর্মী তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল উপরের একটা ঘরে। তাঁর পারমিট দেখতে চাইল। মালপত্র ভালোমতো তল্লাশি করা হলো। তারপর বলল, 'আপনি এখানে বসে থাকুন। কোথাও যাবেন না।'

নবাবজাদা জুলফিকার কাছে এসে বললেন, 'মনে হয় কিছু একটা করবে। প্লেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে তবু প্লেন ছাড়ছে না। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঝামেলা করবে।'

এর মধ্যেই খবর পেয়ে গেলেন, বিমানের সকল যাত্রীকে বিমানে উঠতে দিল, আবার নামিয়ে নিয়ে এলো। সম্ভবত ওরা উপর মহলের নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। নবাবজাদাও এর মধ্যে খবর নিয়ে এসে

বললেন, 'যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই হয়েছে। আপনার ব্যাপার নিয়েই প্লেন ছাড়তে দেরি করছে।'

তিনিও বুঝতে পেরেছেন আগেই, তাঁকে ওরা আটকে দেবে নাকি যেতে দেবে, এ নিয়ে দ্বিধায় ভুগছে। আর সেকারণেই দেরি।

নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পর বিমান ছাড়ার অনুমতি পেল এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ। আর তাঁকে বলল, 'আপনি যেতে পারেন।'

নবাবজাদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিমানে চড়ে বসলেন তিনি। বিষয়টা বেশ রহস্যময় মনে হলো তাঁর কাছে। ইচ্ছে করলে তাঁকে গ্রেফতার করতে পারত পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। কিন্তু করল না কেন? রহস্যটার একটা সমাধান উঁকিঝুঁকি মারল তাঁর মনে, ওরা দেখল বাংলার ঝঞ্ঝাট পাঞ্জাবে টেনে এনে লাভ নেই। তারচেয়ে বরং যেতে দিলেই ঝামেলা কম। আর তিন দিনের মধ্যেই তো ভারত ছাড়তে হবে তাঁকে। পূর্ব বাংলা সরকারকে খবর দিলেই দর্শনায়, নয়তো বেনাপোলে তাঁকে গ্রেফতার করতে পারবে সহজেই। তাছাড়া কলকাতার সরকারি কর্মচারীরাও খবর পেলে আরো ভালো। কলকাতার জেলেও পুরে দিতে পারে। কারণ তিনি যে শহীদ সাহেবের লোক।

অবশেষে দিল্লি পৌঁছলেন তিনি। সোজা রেলস্টেশনে হাজির হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির ওয়েটিংরুমে মালপত্র রাখলেন। দিল্লি থেকে ট্রেনে যাবেন হাওড়া। টিকেটও কিনে নিয়েছেন। ট্রেন ছাড়বে রাতে।

গোসল করে করে কিছু খেয়ে মালপত্র দারোয়ানের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। হাতে অনেক সময়। একটা টাঙ্গা ভাড়া করে দিল্লি জামে মসজিদের কাছে পৌঁছলেন। ইচ্ছে মুসলমানদের অবস্থা দেখা। দেশভাগের সময় ভয়াবহ দাঙ্গা লেগেছিল দিল্লিতে। মুসলমানদের বেশ কিছু দোকান দেখতে পেলেন। এরপর নতুন দিল্লি ঘুরে দেখলেন।

রাতের ট্রেনে চড়ে বসলেন তিনি। সিট রিজার্ভ ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণিতে আরও তিনজন ভদ্রলোক ছিলেন। কিন্তু কারো সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন না। একটা কাগজ নিয়ে পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম ভাঙল ভোরে। দুজন যাত্রী এর মধ্যেই নেমে পড়েছেন। একজন আছেন। তাঁর কাছে জানতে চাইলেন লোকটি, 'কোথা থেকে এসেছেন? কোথায় যাবেন?'

বললেন, 'লাহোর থেকে দিল্লি। আর এখন দিল্লি থেকে যাব পূর্ব বাংলায়। আমার বাড়ি ফরিদপুর জেলায়।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমার বাড়িও বরিশাল জেলায় ছিল। এখন চাকরি করি দিল্লিতে।'

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'হায় পূর্ব বাংলা! পূর্ব বাংলার মাছ তরকারি, পূর্ব বাংলার আলো বাতাস! এর সঙ্গে তুলনা হয় না। আর কখনো পূর্ব বাংলায় যেতে পারব কি না জানি না। মনে হয় আর যেতে পারব না। বরিশালে এখন আর আমার কেউ নেই।'

কথা বলতে বলতে হাওড়া স্টেশন চলে এলো। নামার সময় লোকটি বললেন, 'আসুন না আমার সঙ্গে! রাতে আমার বাড়িতে থাকতে পারবেন। কোনো অসুবিধা হবে না। অনেক দিন পর পূর্ব বাংলার কারো সঙ্গে আলাপ হলো।'

তিনি বললেন, 'ধন্যবাদ। আমারও ইচ্ছে করছে আপনার অতিথি হওয়ার। কিন্তু কাল সকালেই আমাকে চলে যেতে হবে। রাতে এক বন্ধুর বাড়িতে থাকব।'

ট্রেন থেকে নেমে গেলেন তিনিও। কোথায় থাকবেন ভাবতে লাগলেন। হোটেলে থাকা যাবে না। পার্ক সার্কাসে বন্ধু নূরুল আলমের বাসা। ওখানেই গেলেন।

সকাল এগারটায় খুলনার ট্রেন। প্রায় সন্ধ্যায় বেনাপোল পৌঁছে এবং রাত দশটায় খুলনায়। ইন্টারক্লাসের টিকেট কাটলেন। কারণ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চলতে হবে এখন থেকে। তিনি নিশ্চিত পূর্ব বাংলা সরকারও তাঁর খবরাখবর রাখছে। তিনি যে দু-একদিনের মধ্যে পৌঁছবেন এটাও ওরা জানে। গোয়েন্দা বিভাগ তাঁর গতিবিধির ওপর নজর রাখতে শুরু করেছে। যে কোনো সময় তাঁকে গ্রেফতার করবে। তিনিও গ্রেফতার হওয়ার জন্য প্রস্তুত। তবে...

এই তবেটার জন্যই তিনি এখনই গ্রেফতার হতে চাইছেন না। তবেটা কী?

গ্রেফতার হওয়ার আগে একবার বাবা-মা, ভাইবোন, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে চান। লাহোর থেকে স্ত্রী রেণুকে চিঠি দিয়েছিলেন। এতদিনে সেটা পেয়ে যাওয়ার কথা। বাড়ির সকলেই তাঁর অপেক্ষায়।

ঢাকায়ও যাওয়া দরকার। সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। তিনি গ্রেফতার হওয়ার পর যেন কোনো কাজ বন্ধ না হয়। কিছু টাকাও জোগাড় করে রাখতে হবে।

রানাঘাট এসে ট্রেন থামল অনেকক্ষণ। ভারতের কাস্টম অফিসাররা গাড়ি ও যাত্রীদের মালপত্র তল্লাশি করলেন। তাঁর মালপত্রও দেখল। আর ঠিক সন্ধের মুখে ট্রেন এসে পৌঁছাল বেনাপোল। এখানে মালপত্র তল্লাশি করবে পাকিস্তানের কাস্টমস। ট্রেনেই এক যাত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাকে বললেন, 'কাস্টমস এলে আমার মালপত্র দেখিয়ে দেবেন দয়া করে। আমার একটু কাজ আছে। আসতে দেরিও হতে পারে।'

বলেই অন্ধকার দেখে একটা গাছের নিচে আশ্রয় নিলেন। অনেকক্ষণ দেরি করল ট্রেন। দূর থেকে দেখতে পেলেন গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন আর পুলিশ ঘোরাফেরা করছে। ট্রেনের ভিতর তন্ন তন্ন করে কী যেন খুঁজছে। এক জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পেলেন না তিনি। ট্রেনের ভিতরেই এদিক ওদিক ঘোরফেরা করতে লাগলে। ওদের খোঁজাখুঁজি দেখে একবার ট্রেনের অন্যপাশে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। ওদেরকে ফাঁকি দিতেই হবে। মন চলে গেছে বাড়িতে। কয়েকমাস আগে বড় ছেলে কামালের জন্ম হয়েছে। ভালো করে ছেলের মুখটাও দেখতে পারেননি। মেয়েটা তো তাঁকে পেলে আর ছাড়তেই চায় না। ওদিকে দলের জন্য জেল অত্যাচার সহ্য করছেন তাঁর সহকর্মীরা। তাদের জন্য কিছু হয়তো এখন করা সম্ভব নয়, কিন্তু তাদের কাছে তো যেতে পারবেন! একবার হলেও দেখা তো করতে পারবেন!

ভাবতে ভাবতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। চলতে শুরু করল আস্তে আস্তে। এক দৌড়ে ট্রেনে উঠে পড়লেন মুজিব। আর এক মিনিট দেরি হলেই ট্রেনে উঠতে পারতেন কিনা সন্দেহ। এরপর গন্তব্য যশোর। ওখানেও হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হবে। স্টেশনে গোয়েন্দারা থাকবেই।

যশোরে ট্রেন থামার কয়েক মিনিট আগেই বাথরুমে চলে গেলেন তিনি। ট্রেন ছাড়ার পর বেরিয়ে এলেন। দেখলেন তার কামরায় এক ছাত্র উঠে বসে আছে। তাঁকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, মুজিব ভাই...!'

বাকিটা বলার সুযোগ না দিয়েই ছাত্রকে কাছে ডাকলেন। নিচু গলায় বললেন, 'আমার নাম ধরে ডাকবা না। বুঝতেই পারছ।'

ছাত্রলীগের সদস্য ছিল ছেলেটি। বুঝে গেল আসলে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন। অনেক যাত্রী ছিল কামরায়। সম্ভবত কেউ বুঝতে পারেনি। খানিক পর ছাত্রটি নেমে গেল।

খুলনা স্টেশন বেশ ভালোভাবেই জানা তাঁর। ছোটবেলা থেকে খুলনা হয়ে যাতায়াত করেন। কলকাতায় লেখাপড়া করতেও খুলনা হয়ে যাওয়া আসা করতে হতো। রাত দশটা বা এগারটার দিকে খুলনায় এসে পৌঁছল ট্রেন। সব যাত্রী নেমে গেল কামরা থেকে। গা থেকে পাঞ্জাবি খুলে বিছানার মধ্যে পেঁচিয়ে নিলেন তিনি। পরনে লুঙ্গি। লুঙ্গিটা একটু উপরে উঠিয়ে বেঁধে নিলেন। বিছানাটা ঘাড়ে আর সুটকেসটা হাতে নিয়ে নেমে পড়লেন ট্রেন থেকে। ছুটতে লাগলেন কুলিদের মতো। জাহাজঘাট সামনেই। ওদিকেই যাচ্ছেন তিনি। গোয়েন্দাদের দেখেই চিনতে পারলেন। ঘোরাঘুরি করছে। কিন্তু তাঁকে চিনতে পারল না।

রেলরাস্তা পার হয়ে জাহাজঘাটে ঢুকে পড়লেন। এরপর অন্য পথ দিয়ে রাস্তায় চলে এসে একটা রিকশায় মালপত্র রাখলেন। পাঞ্জাবিটা বের করে গায়ে দিলেন। রিকশাওয়ালাও গোপালগঞ্জের। তাঁকে চিনে ফেললেন। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ভাইজান না! কোথা থেকে এলেন এভাবে?'

ফিস ফিস করে বললেন, 'সে অনেক কথা। পরে বলব। এখন রিকশা ছেড়ে দাও।'

যেতে যেতে পথে রিকশাওয়ালাকে কিছুটা বললেন তিনি। আর পই পই করে বলে দিলেন যেন কাউকে না বলে। খুলনায় তাঁর এক ভাই থাকেন। তাঁর বাসায় পৌঁছলেন তিনি। আর রিকশাওয়ালাকে দিয়ে খবর পাঠালেন মামার কাছে। মামার কাছে জানতে পারলেন, জাহাজ ছাড়বে সকাল ছয়টায়।

মামাকে পাঠিয়ে দিলেন জাহাজঘাটে। প্রথম শ্রেণির দুটো আসন রিজার্ভ করিয়ে রাখলেন। যাতে তাঁর কামরায় আর কেউ না ওঠে। জাহাজ কোম্পানিতে তাঁর এক বন্ধু চাকরি করতেন। বন্ধুকেও খবর পাঠালেন তিনি। বন্ধুও তাঁকে সাহায্য করার আশ্বাস দিলেন। বন্ধু বললেন, 'ছাড়ার ঠিক দু মিনিট আগে তুমি জাহাজে উঠবে। তুমি জাহাজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি জাহাজ ছাড়ার ব্যবস্থা করব।'

এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। জাহাজঘাটেও গোয়েন্দাদের উপস্থিতি টের পেয়েছেন তাঁর বন্ধু। তাই এই সতর্কতা।

কিন্তু পরদিন ভোরে জাহাজঘাটে গিয়ে হতাশ হতে হলো। বেশ কুয়াশা পড়েছিল। ঘন কুয়াশার কারণে ছয়টার বদলে সাতটায় জাহাজ ছাড়ার সিদ্ধান্ত হলো। বেশ বিপদে পড়া গেল! ছয়টায় একটু অন্ধকার থাকে। গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দেয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু এখন! সাতটায় তো সূর্য উঠে যায়।

মামা তাঁর মালপত্র নিয়ে আগে উঠেই কামরা ঠিক করে রেখেছিলেন। আর তিনি কাছের একটা দোকানে ঘাপটি মেরে বসেছিলেন। খুলনার গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা তাঁকে চেনে। ওদের চোখকে ফাঁকি দেয়া সহজ হবে না। কাজেই বেশভুষা বদলাতে হলো তাঁকে। প্যান্ট পরলেন। গায়ে কোট চাপালেন। আর মাথায় দিলেন হ্যাট। তাঁকে তখন চেনার সাধ্যি কার?

চারদিক ফকফকা। ওই তো জাহাজ ছাড়বে ছাড়বে করছে। জাহাজের চারটা সিঁড়ির দুটো ততক্ষণে টেনে নিয়েছে। আরো দুটো বাকি। তখনই এক দৌড়ে জাহাজে উঠলেন তিনি। জাহাজে ওঠার পর তাকিয়ে দেখলেন তাঁর বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে ঘাটে। তিনি ওঠার পরপরই দুটো সিঁড়ি টেনে নিল খুব দ্রুত। আর জাহাজ ছেড়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে। যাক, গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিতে পেরেছেন তিনি। বন্ধুর দিকে তাকালেন। চোখে চোখে আলাপ হলো বন্ধুর সঙ্গে। দুই চোখ দিয়েই কৃতজ্ঞতা জানালেন বন্ধুকে।

এতদূর পর্যন্ত যখন গোয়েন্দাদের এড়িয়ে আসতে পেরেছেন, তবে নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরতে পারবেন। কামরাতে শুয়েই থাকলেন তিনি। খাবার আনিয়ে কামরায় বসেই খেলেন। তিনি যে জাহাজে উঠেছেন এটা অনেকেই দেখে ফেলেছেন। জাহাজে গোপালগঞ্জের অনেক মানুষ। এ জাহাজ গোপালগঞ্জ হয়ে বরিশাল ও নারায়ণগঞ্জ যায়। তবে গোপালগঞ্জ শহরে যায় না। তিন মাইল দূরে মানিকদহ নামের নতুন ঘাটে থামে। কারণ নদী ভরাট হয়ে গেছে। শহরে যাওয়ার অবস্থা আর নেই।

মানিকদহে জাহাজ ভিড়ছে। টের পেলেন তিনি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। ঘাট থেকেই তাঁকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল রহমত জান আর ইউনুস। এরা দুজনই ছাত্রলীগের ভালো কর্মী। বরিশাল কলেজে পড়ে। এই জাহাজেই বরিশাল যাবে ওরা।

চোখের ইশারায় ওদের থামিয়ে দিলেন তিনি। কারণ তিনি বাড়িতে এসেছেন, খবরটা পেলেই পুলিশ গিয়ে সোজা হাজির হবে তাঁর বাড়িতে।

ওরা জাহাজে উঠল। ততক্ষণে জাহাজ ছেড়ে দিল। খানিকপর তাঁর কাছে চলে এলো রহমত জান আর ইউনুস। তিনি জানতে চাইলেন, 'আমি তো বেশ পাল্টেছি। তবু তোমরা আমায় চিনলা কেমন করে? '

ওরা বলল, 'যতই বেশ পাল্টান, আপনার ওই চোখ তো আমাদের বহু পরিচিত।'

'পুলিশ খবর পেলে রাস্তায় গ্রেফতার করার চেষ্টা করতে পারে।'

'উঁহু। ভাইজান, এটা গোপালগঞ্জ। এখান থেকে ইচ্ছা না করলে ধরে নেয়ার ক্ষমতা কারো নাই।'

গোপালগঞ্জের মানুষ, বিশেষ করে ছাত্র ও যুবকরা তাঁকে ভাইজান বলে ডাকে।

বাড়ির কাছাকাছি পাটগাতি ঘাটে এসে জাহাজ ভিড়ল। তখন সন্ধে নেমে গেছে। এখান থেকে বাড়ি যেতে নৌকায় এক ঘণ্টার পথ। এই এক ঘণ্টা যে কত দীর্ঘ মনে হয়েছিল তাঁর! আর বাড়িতে যখন পৌঁছলেন, তখন তাঁকে দেখে তো সবাই খুশি। যেন ঈদের খুশির ধুম পড়েছে বাড়িতে। কারণ কেউ ভাবতেই পারেনি, তিনি সোজা বাড়িতে এসে হাজির হবেন।

বাড়িতে সাত-আটদিন কাটিয়ে আবার দলের কাজে নেমে পড়লেন মুজিব।

চলে এলেন ঢাকা। এখানে ওখানে থাকেন। পুলিশের চোখ এড়িয়ে চলেন। দিনে বাড়িতে থাকেন। বই পড়েন। আর রাতে দলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন। আলাপ করেন। পরিকল্পনা করেন। কিন্তু এভাবে কতদিন? আওয়ামী লীগ থেকে অনেক প্রবীণ নেতা বেরিয়ে গেছেন ভয় পেয়ে। এর মধ্যেই ঠিক হলো, আরমানিটোলায় একটা জনসভা হবে। ওখানে মুজিব ভাষণ দেবেন। এবং তারপর গ্রেফতার হবেন। কিন্তু সভার দুদিন আগেই তাঁর থাকার বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে পুলিশ। তিনি যে ঘরে থাকেন, সে ঘরের দরজায় এসে টোকা দিলেন গোয়েন্দারা। ঘরের ভিতর থেকে মুজিব বললেন, 'ভিতরে আসুন।'

গোয়েন্দা পুলিশ ভিতরে আসার পরে মুজিব বললেন, 'কয়েকদিন

পর্যন্ত আপনাদের অপেক্ষাতেই আছি। বসুন, কিছু খেয়ে নিতে হবে। এখন বেলা দুইটা, কিছুই খাই নাই। খাবার আনতে গেছে।'

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম। আর ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে তিনবার জেলে এসে পড়েছেন মুজিব।

আওয়ামী লীগ গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে ড্রাফট পার্টি ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করা হয়েছিল। তাতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের কথা ছিল। এতে আরো খেপে গিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানিরা। সংখ্যাগুরু হয়েও পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যে উদারতা দেখিয়েছিল, দুনিয়ার আর কোথাও এর নজির নেই। সংখ্যাগুরু হয়েও পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে রাজধানী করা হয়। এ দেশের মানুষ আপত্তি করেনি। শিল্প-কারখানাও গড়ে উঠতে লাগল পশ্চিমে। কয়েকজন মন্ত্রী ছাড়া পূর্ব বাংলার উল্লেখ করার মতো কিছু নেই। বড় বড় সরকারি চাকরিতে বঞ্চিত করা হচ্ছিল এদেশকে।

টানা বন্দিজীবন কাটাতে লাগলেন মুজিব। এই মামলা, সেই মামলা। ঢাকা থেকে ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, খুলনা—নানান জেলে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে বন্দি হয়ে।

মুজিব তখন ফরিদপুর জেলে। হাসপাতালের একটা ঘরে তাঁকে রাখা হয়েছে। প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ে খানিকসময় কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এক সকালে নামাজ আর কুরআন তেলাওয়াত সেরে কিছুক্ষণ হাঁটাচলা করলেন। তারপর বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন। তখন এক আধাবুড়ো কয়েদি এলেন। এই কয়েদিও জেলের হাসপাতালে ভর্তি। শেখ মুজিবের কাছে এসে মাটিতে বসে পড়লেন বুড়ো। শেখ মুজিব জানতে চাইলেন, 'আপনার বাড়ি কোথায়?'

বুড়ো জবাব দিলেন, 'বাড়ি গোপালগঞ্জ থানায়, ভেন্নাবাড়ি গ্রামে। নাম রহিম।'

'আপনার নামই রহিম মিয়া?'

বুড়ো আরো কিছু শোনার আশায় শেখ মুজিবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শেখ মুজিব কিন্তু চিনে ফেলেছিলেন বুড়োটাকে। রহিম মিয়া নামে পরিচিত। তার চেয়ে বড় ডাকাত আর গোপালগঞ্জ মহকুমায় ছিল না তখন। রহিম ডাকাতের নাম শুনলেই মানুষ ভয় পেত। তবে রহিম মিয়া ছিল চোর। বাধা দিলে ডাকাতি করত। শেখ মুজিব জিজ্ঞেস করলেন,

'রহিম মিয়া আপনিই না আমাদের বাড়িতে চুরি করে সর্বস্ব নিয়ে এসেছিলেন।'

এবার আর রহিম মিয়ার মুখে কথা নেই। শেখ মুজিবের মনে পড়ল সব। ১৯৩৮-৩৯ সালের কথা। শেখ মুজিবদের ঘরে তখন মা আর বোনদের সোয়াশো ভরি সোনার গহনা ছিল। আর তাঁর মায়ের কয়েক হাজার টাকা ছিল নগদ। তাঁর বাবা তখন গোপালগঞ্জ ছিলেন। শেখ বাড়িতে দু-চারশো বছরে একদিনও চুরি ডাকাতি হয়নি। ওটাই ছিল প্রথম।

একটু পর আস্তে আস্তে মুখ খুলতে শুরু করলেন চোরা রহিম, 'হ্যাঁ। আমি চুরি করেছিলাম।'

শেখ মুজিব অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, 'আমাদের বাড়িতেও সাহস করে এলেন কি করে? আমাদের ঘরে বন্দুক আছে। অনেক শরিকদের বাড়িতে বন্দুক আছে। এত বড় বাড়ি, কত লোক।'

রহিম চোরা বললেন, 'গ্রামের লোক এবং আপনাদের বড়ির লোক সাথে ছিল।'

মনে পড়ল শেখ মুজিবের। চুরির দুদিন পর খবর পেয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের বাড়িতে কাজ করে এক লোক, কেয়ারা নৌকা চালাত। সে-ই দলবলসহ রহিম মিয়াকে নিজের নৌকায় করে নিয়ে আসে। চুরির তিনদিন পরে সেই চাকর নিজে এসে স্বীকার করে যায়। থানায় মামলা হয়েছিল। কিন্তু মালপত্র ধরা না পড়ায় মামলার কিছুই হয়নি। থানার এক দারোগাই মামলাটা নষ্ট করে দিয়েছিল। রহিমকে ধরা যায়নি তখন। ধরতে পারলে গয়না কিছু পাওয়া যেত। তাঁর বাবা শেখ লুৎফর রহমান থানার দারোগার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। তখনকার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট দারোগার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। কিন্তু রহিম চোরের খবর এতদিন অজানাই ছিল শেখ মুজিবের। কোথায় ছিল সে? নিজের মুখে বলতে শুরু করল রহিম মিয়া। 'আপনাদের বাড়িতে চুরি করে যখন কিছু হলো না, তখন ঘোষণা করলাম, লোকে বলে চোরের বাড়িতে দালান হয় না, আমি দালান দেব। দেশের লোক বুঝতে পারল। কিছুদিন পরে আর একটা ডাকাতি করতে গেলাম বাগেরহাটে। সেখানে ধরা পড়লাম। অনেক টাকা খরচ করে জামিন নিয়ে দেশে এলাম। তারপর আরেকটা ডাকাতি করতে গেলাম, গোপালগঞ্জের উলপুর গ্রামের রায়চৌধুরীদের বাড়িতে। ডাকাতি করে

ফিরবার পথে পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করল। তাদের জানা ছিল আমি কোন পথে ফিরব। এ মামলাটায় জামিন নিলাম, তারপরে আবার ডাকাতি করতে গেলাম আর এক জায়গায়। সেখানেও ধরা পড়লাম, আর জামিন পেলাম না। সকল মামলা মিলে আমার পনের-ষোল বছর জেল হয়েছে। পাকিস্তান হওয়ার পূর্বে দমদম জেলে ছিলাম। সেখান থেকে রাজশাহী, তারপর ফরিদপুর জেলে এসেছি। জানেন, জীবনে ডাকাতি বা চুরি করতে গিয়ে আমি ধরা পড়ি নাই, কিন্তু আপনাদের বাড়ি চুরি করার পর যেখানেই গেছি ধরা পড়েছি। জেলে বসে চিন্তা করে দেখলাম, আপনাদের বাড়ি আমাদের পুণ্যস্থান ছিল, সেখানে হাত দিয়ে হাত জ্বলে গেছে। আপনার মা'র কাছে ক্ষমা চাইতে পারলে বোধহয় পাপমোচন হতো।'

একনাগাড়ে কথা বলে এবার দম নিলেন রহিম চোরা। শেখ মুজিব বললেন, 'রহিম মিয়া, আমার মা ও আব্বা বড় দুঃখ পেয়েছিলেন। কারণ আমাদের সর্বস্ব গেলেও কিছু হতো না কিন্তু আমার বিধবা বড়বোনের গহনাই বেশি ছিল। সে একটা ছেলে ও একটা মেয়ে নিয়ে উনিশ বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল।'

রহিম মিয়া বলল, 'আর জীবনে চুরি করব না। আরও কয়েক বছর খাটতে হবে। শরীর ভেঙে গেছে।'

তারপর শেখ মুজিবকে অনুরোধ করল রহিম মিয়া, কিছু দরকার হলে যেন তাকে জানায়। যে কোনো দরকারে সে কাজে লাগতে পারে। কারণ তার গলায় 'খোকর' আছে। সেই খোকরে সোনার গিনি রাখা আছে।

শেখ মুজিব মুখে বললেন, 'কোনো প্রয়োজন নাই।'

আর মনে মনে বললেন, 'হ্যাঁ, সোনার গিনি থাকবে না, তো থাকবে কি? সোয়া শত ভরির গহনা তো সোজা কথা না!'

রহিম মিয়ার শরীর স্বাস্থ্য এমনিতেই ভেঙে পড়েছিল। প্রায়ই হাসপাতালে ভর্তি থাকত। তবে সময় সুযোগ পেলেই শেখ মুজিবের কাছে চলে আসত। সুখ-দুঃখের আলাপ করত। শেখ মুজিবেরও মনে হয়েছিল, রহিম মিয়ার মনে বোধহয় পরিবর্তন এসেছে।

টানা ছাব্বিশ-সাতাশ মাস বিনাবিচারে জেলে বন্দি। তাঁকে মুক্তি দিচ্ছিল না সরকার। ফরিদপুর জেলে এসে আমরণ অনশন শুরু করলেন মুজিব। এ সময় তাঁকে জোর করে নাক দিয়ে নল ঢুকিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা

করা হয়। নাকের ভিতর নল দিয়ে পেট পর্যন্ত নল ঢুকিয়ে দিত। তারপর নলের মুখে একটা কাপের মতো লাগিয়ে দিত। সে কাপের মধ্যে দুধের মত পাতলা করে খাবার তৈরি করে পেটের ভিতর ঢেলে দিত। দুতিনবার এভাবে দেয়ার পরই ঘা হয়ে যায় নাকে। রক্ত চলে আসে নাকে। ভীষণ যন্ত্রণা। বাধা দিতেন মুজিব। বিছানা থেকে উঠারও শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন মুজিব। নিঃশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হতো। তখনই ভেবেছিলেন আর বুঝি বেশিদিন বাঁচবেন না।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। জেলে থেকেই শুনলেন ঢাকায় বেশ গোলমাল হয়েছে। ফরিদপুরে হরতাল হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা শোভাযাত্রা করে জেল গেটে এসেছিল। স্লোগানও দিয়েছিল। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বাঙালিদের শোষণ করা চলবে না', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', রাজবন্দিদের মুক্তি চাই'। জেলে বসে ২২ তারিখের পত্রিকায় খবর জানলেন মুজিব। মাতৃভাষা আন্দোলনে পৃথিবীতে এই প্রথম বাঙালিরা রক্ত দিল। ২৫ তারিখ সকালে মুজিবকে পরীক্ষা করতে এলেন সিভিল সার্জন। মুজিব দেখলেন তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। মুজিব বুঝলেন তাঁর দিন ফুরিয়ে গেছে। সিভিল সার্জন মুজিবকে বললেন, 'এভাবে মৃত্যুবরণ করে কি কোনো লাভ হবে? বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে।' অনেক কষ্টে আস্তে আস্তে মুজিব বললেন, 'অনেক লোক আছে। কাজ পড়ে থাকবে না। দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসি, তাদের জন্যই জীবন দিতে পারলাম, এই শান্তি।' ডেপুটি জেলার জানতে চাইলেন, 'কাউকে খবর দিতে হবে? আপনার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী কোথায়? আপনার আব্বার কাছে কোনো টেলিগ্রাম করবেন?' মুজিব বললেন, 'দরকার নাই। তাদের কষ্ট দিতে চাই না।'

জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন মুজিব। তাঁর হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। একজন কয়েদি তাঁর হাতে পায়ে সরিষার তেল গরম করে মালিশ করতে শুরু করল।

২৭ ফেব্রুয়ারি রাত আটটা। চুপচাপ শুয়েছিলেন মুজিব। কারো সাথে কথা বলার শক্তিও নেই। কয়েদির সাহায্যে ওজু করে আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নিয়েছেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছে বড়জোর আর দু-একদিন বাঁচবেন। তখনই দরজা খুলে ডেপুটি জেলার এসে মুজিবের পাশে বসলেন। বললেন, 'আপনাকে যদি মুক্তি দেওয়া হয়, তবে খাবেন তো?'

মুজিব বললেন, 'মুক্তি দিলে খাব, না দিলে খাব না। তবে আমার লাশ মুক্তি পেয়ে যাবে।'

তখনই ডেপুটি জেলার বললেন, 'আপনার মুক্তির অর্ডার এসে গেছে রেডিওগ্রামে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অফিস থেকেও অর্ডার এসেছে। দুইটা অর্ডার পেয়েছি।'

এর মধ্যেই ডাবের পানি আনিয়েছেন ডাক্তার সাহেব। ডাবের পানিতে

অনশন ভাঙলেন মুজিব। কিন্তু মুক্তির আদেশ এলেও জেলের বাইরে যাওয়ার শক্তি নেই তাঁর। সারা রাত একটু একটু করে ডাবের পানি খেলেন। সকালে সামান্য খেয়ে আবার ডাব খেলেন। সকাল দশটায় খবর পেলেন বাবা এসেছেন। কিন্তু জেলগেটে তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বাবাকে ভিতরে নিয়ে আসা হলো। মুজিবকে দেখে আর কান্না আটকে রাখতে পারলেন না বাবা।

১৯৫২ সালের পুরো মার্চ মাস বাড়িতে কাটালেন মুজিব। শরীরটা একটু ভালো হয়েছে। হার্টের দুর্বলতা রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঢাকায় ফিরতে হবে তাঁকে। তিনি জেলের বাইরে, ওদিকে আওয়ামী লীগের বাকি নেতারা তখন জেলে। দলের কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে আছে। কেউ সাহস করে কিছু বলছে না। মুসলিম লীগ সরকার অত্যাচারের স্টিম রোলার চালিয়ে দিয়েছিল। তাই বলে বসে থাকলে তো চলবে না। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঢাকা এলেন মুজিব। ততদিনে আওয়ামী লীগ অফিস মোগলটুলী থেকে নবাবপুরে স্থানান্তর হয়ে গেছে। ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকলেন মুজিব। সেক্রেটারি শামসুল হক সাহেব তখন জেলে। কমিটির বারো-তেরো জন সদস্য ছিলেন সভায়। মুজিবকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক করা হলো। আওয়ামী লীগকে গড়ার সুযোগ পেলেন মুজিব। দু-তিনটা ছাড়া সব জেলায় কমিটিও গঠন করা হয়নি। সাহস করে কাজ করে যেতে পারলে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। জনগণ মুসলিম লীগকে আর চায় না। একমাত্র বিরোধীদল আওয়ামী লীগ, যার আদর্শ ও নীতি আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় অসুবিধা একটা আছে। আর সেটা হচ্ছে টাকা।

দলের সাধারণ সম্পাদক হয়ে প্রেস কনফারেন্স করলেন মুজিব। বেশ কয়েকটি দাবি জানালেন তিনি। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে, রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে হবে, যাঁরা ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ হয়েছেন তাঁদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যারা অন্যায় জুলুম করেছে তাদের শাস্তি দিতে হবে। আর সরকার যে বলেছে, বিদেশি কোনো রাষ্ট্রের উসকানিতে এই আন্দোলন হয়েছে, তার প্রমাণ দিতে হবে। হিন্দু ছাত্ররা কলকাতা থেকে এসে পায়জামা পরে আন্দোলন করেছে, এমন কথাও বলেছে মুসলিম লীগ নেতারা। ছাত্রসহ যে পাঁচ-ছয়জন শহীদ হয়েছেন তারা সকলেই তো মুসলিম। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে শতকরা

নিরানব্বইজন মুসলমান। এত ছাত্র কলকাতা থেকে এলো যে, সরকার তাদের একজনকেও ধরতে পারল না, তাদের ক্ষমতায় থাকারও অধিকার নেই।

দলের সাথে আলোচনা করে করাচি গেলেন মুজিব। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজবন্দিদের মুক্তি দাবি করলেন। সাংবাদিক সম্মেলন করে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানালেন। তখনও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের ধারণা ছিল আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা নেই। সরকারসমর্থক পত্রিকাগুলো সত্যকে লুকিয়ে রেখেছিল। প্রথমবার করাচি গিয়ে অবাক হয়েছেন মুজিব। সবুজের দেশে জন্ম নেয়া বাঙালিদের বালুময় করাচি পছন্দ হওয়ার কথা নয়। মুজিব বলেছেন, 'প্রকৃতির সাথে মানুষের মনেরও একটা সম্বন্ধ আছে। বালুর দেশের মানুষের মন বালুর মতো উড়ে বেড়ায়। আর পলিমাটির বাংলার মানুষের মন ঐ রকমই নরম, ঐ রকমই সবুজ। প্রকৃতির অকৃপণ সৌন্দর্যে আমাদের জন্ম, সৌন্দর্যই আমরা ভালোবাসি।'

করাচি থেকে ফিরে দল গঠনে কাজ শুরু করলেন মুজিব। এর মধ্যেই বিশ্বশান্তি সম্মেলনে পিকিং যান। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ ও ১৬ তারিখ সম্মেলন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর প্রতিনিধিরা থাকবেন শান্তি সম্মেলনে। সমস্ত পাকিস্তান থেকে ত্রিশজন। অথচ পূর্ব পাকিস্তান থেকে মাত্র পাঁচজন। রেঙ্গুন, থাইল্যান্ড ও হংকং হয়ে চীনে পৌঁছলেন মুজিব। খুব কাছ থেকে চীনকে দেখলেন। উদীয়মান চীন। স্বাধীনতা পাওয়ার পর যেন জেগে উঠেছে। সাঁইত্রিশটা দেশের তিনশো আটাত্তর জন সদস্য হাজির হয়েছিলেন ওই শান্তি সম্মেলনে। পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা একপাশে বসেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বক্তৃতা করলেন আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিব। মুজিব বাংলায় বক্তৃতা করেছিলেন। আতাউর রহমান খান ইংরেজিতে। ওদিকে ভারত থেকে আসা প্রতিনিধি মনোজ বসুও বাংলায় বক্তৃতা করেছেন। মুজিব ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে পারতেন। তবু মাতৃভাষায় বলা কর্তব্য মনে করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতার পর মনোজ বসু ছুটে এসে মুজিবকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ভাই মুজিব, আজ আমরা দুই দেশের লোক, কিন্তু আমাদের ভাষাকে ভাগ করতে কেউ পারে নাই। আর পারবেও না। তোমরা বাংলা ভাষাকে জাতীয়

মর্যাদা দিতে যে ত্যাগ স্বীকার করেছ আমরা বাংলা ভাষাভাষী ভারতবর্ষের লোকেরাও তার জন্য গর্ব অনুভব করি।'

এই সম্মেলনে বিখ্যাত রাশিয়ান কল্পবিজ্ঞান লেখক আইজাক আসিমভের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মুজিবের। মুজিব এটাকে সৌভাগ্য হিসেবেই দেখেছেন। এখানে দেখা হয় আরো এক দুনিয়া বিখ্যাত কবির সঙ্গে। নাজিম হিকমত। তুরস্কের কবি। কিন্তু জেল খেটেছেন অনেক বছর। দেশত্যাগ করে রাশিয়া চলে গিয়েছিলেন।

এগার দিন সম্মেলন শেষ হওয়ার পর দেশে ফেরার সময় হয়ে গিয়েছিল। শান্তি কমিটি জানিয়েছিল, ইচ্ছে করলে চীনের যেখানেই কেউ যেতে চান, তারা দেখাবেন। খরচ দেবে শান্তি কমিটি। মুজিব এই সুযোগ কাজে লাগালেন। দর্শনীয় স্থানগুলো তো দেখলেনই, শিল্প-কারখানা, কৃষকদের অবস্থা, সাংস্কৃতিক মিলনের জায়গা ও জাদুঘরও দেখে বেড়ালেন।

দেশে ফিরে আবার দলীয় কাজে নেমে পড়লেন মুজিব। পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভা করলেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে জেলায় জেলায় ঘুরতে শুরু করলেন মুজিব। ১৯৫৩ সালের শুরু থেকেই রাজনৈতিক ও ছাত্রকর্মীরা মুক্তি পেতে শুরু করল। দলের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকও মুক্তি পেলেন। কিন্তু মুক্তির পর মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে গেলেন শামসুল হক। মুজিব তাঁর চিকিৎসার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাজি হলেন না শামসুল হক। মুজিব তখন তাকে প্রতিষ্ঠানের জেনারেল সেক্রেটারির ভার নিতে অনুরোধ করলেন। কার্যকরী কমিটির সভাও ডাকা হলো এ জন্য। মুজিব ভেবেছিলেন কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লে তিনি ভালো হয়ে যেতে পারেন। শামসুল হক সাহেব সভায় উপস্থিত হয়ে জানিয়ে দিলেন, 'আমি প্রতিষ্ঠানের জেনারেল সেক্রেটারির ভার নিতে পারব না, মুজিব কাজ চালিয়ে যাক।'

মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন মুসলিম লীগ ও মুসলিম লীগ সরকার জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছিল। সুষ্ঠু নেতৃত্ব সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠানের খুব প্রয়োজন এ সময়। সুযোগটা কাজে লাগালেন মুজিব। দেশের শতকরা সত্তরটা ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন। যুবক

কর্মীরা তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। কারণ তিনিও তখন যুবক ছিলেন। দলীয় কাউন্সিলে সাধারণ সম্পাদক হলেন মুজিব।

১৯৫৩ সালে নির্বাচনের ঘোষণা দিল সরকার। ভাসানী-মুজিবের আওয়ামী লীগ, শেরে বাংলা ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টি, মাওলানা আতাহার আলীর নেজামে ইসলাম, হাজী দানেশের গণতন্ত্রী পার্টি ও আবুল হাশিমের খিলাফতে রব্বানী পার্টি অংশ নিল নির্বাচনে।

গোপালগঞ্জ থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হলেন মুজিব। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অনেক কাজ করতে হয়েছিল তাঁকে। সে কারণে নিজের নির্বাচনী এলাকায় প্রচার করার জন্য সময়ও তেমন পাননি। তাঁর বিপক্ষে প্রার্থী ছিলেন মুসলিম লীগের ওয়াহিদুজ্জামান। বেশ ধনী। লঞ্চ, স্পিডবোট, সাইকেল, মাইক্রোফোন কোনো কিছুরই অভাব নেই। সব নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তিনি। অন্যদিকে একটা মাইক্রোফোন আর দুটো সাইকেল ছিল মুজিবের সম্বল। টাকা-পয়সার অভাব তো ছিলই। তবে অভাব ছিল না কর্মীবাহিনীর। কর্মীরা নিজেদের সাইকেল দিয়ে মুজিবের পক্ষে প্রচার চালাতেন। মুজিব পরিবারের কিছু ভালো দেশি নৌকা ছিল। সেগুলো ব্যবহার করলেন। ছাত্র ও যুবক কর্মীরা নিজেদের টাকা খরচ করে কাজ করতে লাগলেন। যে গ্রামেই যেতেন, জনসাধারণ শুধু তাঁকে ভোট দেয়ার জন্য ওয়াদাই করত না। তাঁকে বসিয়ে পান খাওয়াতেন। আবার নজরানা হিসেবে তাঁর সামনে কিছু টাকাও রাখতেন। মুজিব নিতে না চাইলে উল্টো রাগ করতেন। টাকাটা মুজিবকে নয়, নির্বাচনের খরচের জন্য দিতেন তারা।

একবার এক গ্রামে যাবেন মুজিব। যে পথ দিয়ে যাবেন, সে পথে এক বৃদ্ধ মহিলা কয়েক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইলেন। ও পথ দিয়ে যেতেই মুজিবের হাত ধরে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। বললেন, 'বাবা আমার এই কুঁড়েঘরে তোমায় একটু বসতে হবে।'

বৃদ্ধার হাত ধরেই তার বাড়িতে গেলেন মুজিব। অনেক মানুষ মুজিবের সঙ্গে। বাড়ির উঠানে পাটি বিছিয়ে মুজিবকে বসতে দিলেন মহিলা। কিছুক্ষণ পর সামনে এনে রাখলেন এক বাটি দুধ, একটা পান আর চার আনা পয়সা। বললেন, 'খাও বাবা, আর পয়সা কয়টা তুমি নেও, আমার তো কিছুই নাই।'

বৃদ্ধার আন্তরিকতায় মুজিবের চোখ ভিজে উঠল। একটু দুধ মুখে দিলেন। তারপর সেই পয়সার সাথে আরো কিছু টাকা বৃদ্ধার হাতে দিয়ে মুজিব বললেন, 'তোমার দোয়া আমার জন্য যথেষ্ট, তোমার দোয়ার মূল্য টাকা দিয়ে শোধ করা যায় না।'

কিন্তু টাকা না নিয়ে উল্টো মুজিবের মাথায় হাত বুলিয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'গরিবের দোয়া তোমার জন্য আছে বাবা।'

সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মুজিব, 'মানুষেরে ধোঁকা আমি দিতে পারব না।'

নির্বাচনে প্রচার করতে গিয়ে মুসলিম লীগ প্রার্থী বুঝে গিয়েছিলেন, তাঁর পরাজয় নিশ্চিত। এবার অন্য পথ ধরলেন তিনি। অনেক বড় বড় আলেম, পীর ও মাওলানা সাহেবদের হাজির করলেন। গোপালগঞ্জে মুজিবের নিজের ইউনিয়নে পূর্ব বাংলার বিখ্যাত আলেম মাওলানা শামসুল হক। মুজিব তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। ধর্ম সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান রাখতেন। মুজিবের ধারণা ছিল মাওলানা সাহেব তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। কিন্তু মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে মুজিবের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমে পড়লেন। ইউনিয়নের পর ইউনিয়ন স্পিডবোট নিয়ে ঘুরতে লাগলেন। আর ধর্মসভা ডেকে ফতোয়া দিলেন, 'মুজিবকে ভোট দিলে ইসলাম থাকবে না, ধর্ম শেষ হয়ে যাবে।' তাঁর সাথে গলা মেলালেন শর্ষিণার পীর, বরগুনার পীর, শিবপুরের পীর এবং রহমতপুরের শাহ। মুজিবের বিরুদ্ধে যত রকমের ফতোয়া দেয়া যায়, সবই দিলেন। টাকা আর পীরের দোয়া পেতে পীরের মুরিদরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুজিবের বিরুদ্ধে। এমনকি ঢাকা থেকে পুলিশপ্রধানও গোপালগঞ্জে এসে কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন মুসলিম লীগকে সমর্থন করতে। ফরিদপুর জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলতাফ গওহর রাজি না হওয়ায় সরকার তাকে বদলি করে আরেকজন কর্মচারী আনলেন। সরকারি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে তিনি নিজেই মুজিবের বিরুদ্ধে বলা শুরু করলেন এবং নির্বাচনের তিন দিন আগে সেন্টারগুলো সরিয়ে নিলেন। এমন জায়গায় সরালেন যেখানে মুসলিম লীগ প্রার্থীর সুবিধা হয়। নির্বাচনের চারদিন আগে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এসব অপকীর্তির খবর পেয়ে হাজির হয়ে দুটো সভা করলেন। নির্বাচনের একদিন আগে মাওলানা সাহেব একটা সভা করলেন। শুধু তাই নয়,

মুজিবের পক্ষে প্রচারণা করা অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকেও নিরাপত্তা আইনে আটক করা হলো। কিন্তু ফলাফল?

নির্বাচনে দশ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করলেন মুজিব। জনগণ তাঁকে শুধু ভোটই দেয়নি, প্রায় পাঁচ হাজার টাকা নজরানাও দিয়েছিল নির্বাচনের খরচ চালানোর জন্য।

১৯৫৪ সালের মার্চের ৮ থেকে ১২ তারিখের এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট দুই দলই ২৩৭টি মুসলিম আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। যুক্তফ্রন্ট পায় ২২৩টি আসন। মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন। এর মধ্যে চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ফলে মুসলিম লীগের আসন হয় ১০। দশটি আসন না থাকলে গণপরিষদে মুসলিম লীগ দল হিসেবেই বিবেচিত হতো না। এই ২৩৭টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৪৩টি, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ৪৮টি, নেজামে ইসলাম ১৯টি ও গণতন্ত্রী দল ১৩টি আসন।

১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল মন্ত্রিসভা গঠিত হয় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে। আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার পরেও সরকার গঠন করেনি। মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্র থেকে দলকে দূরে রাখাই ছিল এর কারণ। পরে ১৫ মে মন্ত্রিসভা বাড়ানো হয়। পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভায় মাত্র ৩৪ বছর বয়সে সমবায় ও কৃষি উন্নয়ন মন্ত্রী হন শেখ মুজিব। যেদিন মন্ত্রিসভার শপথ সেদিনই নারায়ণগঞ্জের আদমজী পাটকলে বাঙালি ও অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষে দেড় হাজার শ্রমিক নিহত হয়। এটা ছিল মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্র। ঘটনা তদন্ত না করেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পুরো দোষ চাপিয়ে দেয়া হলো যুক্তফ্রন্ট সরকারের ওপর। আর এ কারণে ৩০ মে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা হয়। সরাসরি গভর্নরের শাসন চালু করা হয়। গভর্নর হন ইস্কান্দার মির্জা। জেলে পাঠানো হয় যুক্তফ্রন্টের ১৬০০ নেতাকর্মীকে। শেখ মুজিবসহ নবনির্বাচিত ৩০ জন প্রাদেশিক সদস্যও গ্রেফতার হন। শেখ মুজিবই ছিলেন একমাত্র আটক হওয়া মন্ত্রী। প্রায় দশ মাস জেল খাটতে হয়েছিল তাঁকে। এর মধ্যে ১৯৫৪ সালের ২৩ অক্টোবর পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে গণপরিষদ ভেঙে দেন।

১৯৫৫ সালের ২৮ মে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠন করেন। গণপরিষদের ৬০ জন সদস্যের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্ধেক ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অর্ধেক নেয়া হয়েছিল। ৫ জুন বঙ্গবন্ধু গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন।

এই বছরের ২১ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন হয়। সে অধিবেশনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি প্রত্যাহার করা হয়। দলের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতিবাদে এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। শেখ মুজিব আবার দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। শেখ মুজিব শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড মন্ত্রী। পাকিস্তানের ২৪ বছরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ দুই বছর ক্ষমতায় ছিল। আর কেন্দ্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল ১৩ মাস।

১৯৫৭ সালের ৩০ মে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন শেখ মুজিব। ১৯৫৮ সালে মহাবিপর্যয় নেমে আসে পাকিস্তানে। ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা ও সামরিক বাহিনীপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন। রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দেন। ১১ অক্টোবর শেখ মুজিব গ্রেফতার হন। একের পর এক মিথ্যা মামলা দেয়া হয় তাঁর বিরুদ্ধে। পাকিস্তানের সামরিক সরকার বুঝে গিয়েছিল, শেখ মুজিবকে আটকে রাখতে পারলেই পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার চাওয়ার আর কেউ থাকবে না। এ সময় চৌদ্দ মাস আটক থাকার পর মুক্তি পান মুজিব। কিন্তু জেল গেটেই আবার গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। ১৯৬০ সালের ৭ ডিসেম্বর মুক্তি পান মুজিব। মুক্তি পেয়ে বসে থাকেননি। যদিও তাঁর পিছনে সবসময় গোয়েন্দা লেগে থাকত।

১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি গ্রেফতার করা হলো হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। সঙ্গে সঙ্গে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুরু করেন শেখ মুজিব। সামরিক শাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ঢাকার রাজপথে নেমে পড়েন হাজার হাজার মানুষ। ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখ গ্রেফতার হন মুজিব।

এবার শুরু হলো গণবিক্ষোভ। সামরিক শাসন প্রত্যাহারসহ শেখ মুজিব ও সোহরাওয়াদীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় সরকার। অসুস্থ হয়ে পড়েন সোহরাওয়ার্দী। চিকিৎসার জন্য ইংল্যান্ডে যান। ১৯৬৩ সালের শুরুতে সোহরাওয়ার্দীকে দেখতে লন্ডন যান মুজিব। কিন্তু ওই বছরের ৫ ডিসেম্বর লেবাননের বৈরুতে রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন সোহরাওয়ার্দী।

আইয়ুব খানের আমলে দুই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পার্থক্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। শাসন-শোষণে জর্জরিত বাংলাদেশের মানুষ। দিন দিন এ দেশের মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রই হচ্ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে করা আয়ের সবটাই খরচ হতে লাগল পশ্চিম পাকিস্তানে। বৈদেশিক সাহায্যের সবটাই ব্যয় হচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানের রাজধানী করাচি থেকে সরিয়ে নেয়া হলো রাওয়ালপিন্ডিতে। খরচ হলো ৬৩ কোটি টাকা। এ খরচের সবটুকুই জোগান দিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মানুষ ধীরে ধীরে জেগে উঠছিল। প্রতিবাদ শুরু করল। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের কর্মীরা জনমত তৈরি শুরু করল। বিপুল জনমতের কারণে ঘাবড়ে গেল পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী। ষড়যন্ত্রের জাল বুনল তারা। ১৯৬৪ সালে খুলনা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধিয়ে দিল। উদ্বাস্তু বিহারিরা ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম শুরু করল। 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' নামে প্রচারপত্র বিলি করল আওয়ামী লীগ। দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল বাংলাদেশ। দাঙ্গা-বিরোধী আন্দোলনের কারণে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলাও দিল।

এ বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হলো। মৌলিক গণতন্ত্রের নামে অদ্ভুত এক নির্বাচনে জয়লাভ করলেন আইয়ুব খান। তবে নির্বাচনে জয়লাভ করলেও আইয়ুব খান বুঝতে পারলেন, তাঁর জনপ্রিয়তা নেই। আওয়ামী লীগ তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার জনসমর্থনের জন্য নতুন নতুন ফন্দি আঁটতে লাগলেন আইয়ুব। নতুন ফন্দির একটি ছিল ইসলাম বাঁচাও। ইসলাম বাঁচানোর নাম করে অপসংস্কৃতি ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা অবশ্য এর আগে ব্যর্থ হয়েছে। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য এবার ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন আইয়ুব খান। এই যুদ্ধ আহ্বানের মাধ্যমে দুই পাকিস্তানের মধ্যে ঐক্যের ডাকও দিলেন। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সতের দিনের যুদ্ধ হয় পাকিস্তানের ও ভারতের মধ্যে এবং এ যুদ্ধে

সকল সুরক্ষা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের। পূর্ব পাকিস্তান ছিল একেবারেই অরক্ষিত। এসময় ইচ্ছে করলে পূর্ব পাকিস্তান দখল করে ফেলতে পারত ভারত। দুপক্ষই এ যুদ্ধে জয়লাভ করার কথা বলে। যুদ্ধের পর পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো শক্তপোক্ত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান সেই আগের মতোই অবহেলিত রয়ে যায়। এ দেশের মানুষ আরো অসহায় বোধ করতে থাকে। পাকিস্তানের জাতীয় বাজেটের অর্ধেকেরও বেশি খরচ হতে লাগল প্রতিরক্ষা খাতে। প্রায় সবটাই পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। শেখ মুজিব বুঝলেন, বাঙালি জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প নেই। এজন্য নিজেদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নিজেদেরই নিতে হবে।

পরের বছর দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন মুজিব। কিন্তু হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়ে যান। লাহোরে বিরোধীদলীয় সম্মেলনে আওয়ামী লীগ থেকে যোগ দেন মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগিশ, শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দীনসহ দশ নেতা। ১০ ফেব্রুয়ারি এই সম্মেলনে ছয়দফা ঘোষণা করেন তিনি। ছয়টি দফা ছিল এরকম—

১. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরকার নির্বাচিত হবে। সরকার হবে সংসদীয়। সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবে আইনসভা।
২. কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিভাগ থাকবে। বাকি সব বিষয়ে অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশগুলোর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকবে।
৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে। থাকবে দুটো আলাদা স্টেট ব্যাংক। দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা যদি রাখা হয়, তবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থ পাচার বন্ধ রাখতে হবে। এজন্য দু অঞ্চলের জন্য দুটো পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।
৪. কর ও রাজস্ব ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা থাকবে রাজ্য সরকারের হাতে। আদায়কৃত অর্থের একটা অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা দেবে রাজ্য সরকার।
৫. (ক) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের হিসাব আলাদা আলাদা রাখতে হবে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রায় পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকার থাকবে।

(গ) দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারে দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আদায় করবে কেন্দ্রীয় সরকার।

(ঘ) দেশে উৎপন্ন পণ্যসামগ্রী উভয় দেশের মধ্যে বিনাশুল্কে আমদানি-রফতানি চলবে।

(ঙ) ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়ে বিদেশের সঙ্গে সকল চুক্তি করার ক্ষমতা ও বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের সকল ক্ষমতা থাকবে রাজ্য সরকারের হাতে।

৬. পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য আলাদা প্যারা মিলিশিয়া বা আধা-সামরিক বাহিনী থাকবে। পূর্ব পাকিস্তানে একটা অস্ত্র নির্মাণ কারখানা, একটা সামরিক একাডেমি এবং নৌবাহিনীর সদর দফতর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ছয়দফার পক্ষে ব্যাপক সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু রেগে গেল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। এই দাবি গণদাবি হয়ে গেলে তো তারা আর শোষণ করতে পারবে না। আইয়ুব খান প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন, 'প্রয়োজনে অস্ত্রের মুখে এর জবাব দেয়া হবে।'

পাল্টা জবাবও দিলেন শেখ মুজিব, 'কোনো হুমকিই জনসাধারণকে ছয়-দফা দাবি আদায়ের আন্দোলন থেকে সরিয়ে রাখতে পারবে না।'

এরপর শুরু হলো নির্যাতন। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে খুলনায় জনসভা করে ফেরার পথে যশোরে গ্রেফতার হলেন শেখ মুজিব। ঢাকার সেসন জজ তাঁকে জামিনে মুক্তি দিল। বাড়ি ফেরার পথে আবার গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। নিয়ে যাওয়া হয় সিলেট কারাগারে। সিলেটের কারাগার থেকে মুক্তির পর পরই কারাগারের দরজায় আবার গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় ময়মনসিংহে। ময়মনসিংহের কারাগার থেকে জামিনে মুক্ত হয়ে ঢাকায় ফেরেন মুজিব। তাঁর মুক্তিতে কিন্তু ভীষণ চটে গেলেন পূর্ব বাংলার গভর্নর মোনেম খাঁ। প্রকাশ্যে ঘোষণাও দিলেন, 'আমি যতদিন গভর্নর থাকব, শেখ মুজিব ততদিন জেলে থাকবে।'

৮ মে নিরাপত্তা আইনে আবার গ্রেফতার হন শেখ মুজিব। তাজউদ্দীন আহমদ, জহুর আহমদসহ আওয়ামী লীগের আরো কিছু নেতাও গ্রেফতার হন। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করার কারণে বন্ধ করে দেয়া হয়। তবু ছয়দফা দাবির আন্দোলন ঠেকাতে পারল না পশ্চিম পাকিস্তান। বরং পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কাছে আরো গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল ছয়দফা। মানুষ বুঝতে পারল ছয়দফাতেই মুক্তি। বিক্ষোভে ফেটে পড়ল মানুষ। নিরস্ত্র মানুষের মিছিলের উপর পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারালেন অনেক মানুষ। আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় সকল নেতাকে গ্রেফতার করা হলো।

এবার শুরু হলো নতুনভাবে সাংস্কৃতিক আক্রমণ। ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এবং পহেলা বৈশাখকে ইসলামবিরোধী আখ্যা দেয়া শুরু হয়। জাতীয় সংহতির দোহাই দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতিকে পাকিস্তানি সংস্কৃতিতে রূপান্তর করার চেষ্টা করা হয়। বেতারে রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ করা হয়।

বাঙালিরা যতই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছিল, ততই জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল ছয়দফা। ছয়দফা দেয়া শেখ মুজিব হয়ে উঠছিলেন বাঙালির মুক্তির দূত।

১৯৬৮ সালের প্রথম দিকেই আবার গ্রেফতার হন শেখ মুজিব। মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার জেল গেট থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হলো। নতুন চক্রান্ত শুরু করল পাকিস্তানি শাসকেরা। নতুন একটি মামলা দায়ের করা হলো শেখ মুজিবের নামে—আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি ও ৩৫ জন সামরিক-বেসামরিক নাগরিককে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করা হলো। ১৯ জুন ১৯৬৮ সাল থেকে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে শুরু হলো বিচার। এই মামলায় লিখিত জবানবন্দি দেন শেখ মুজিব। তিনি লেখেন, 'কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যাভাবে জড়িত করা হইয়াছে। ছয়-দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকরির সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবি

আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষষ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।'

শুধু বাংলার মানুষ নয়, পুরো পাকিস্তানের মানুষ আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠছিল। অক্টোবর মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে আইয়ুববিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯৬৯ সালের ৬ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এগারদফা ঘোষণা করল। এর মধ্যে শেখ মুজিবের দেয়া ছয়দফা দাবি তো ছিলই, আগরতলা মামলায় বন্দিদের মুক্তিও দাবি করা হলো। শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠল পুরো পূর্ব পকিস্তান। প্রতিদিন মিছিল, জনসভা হতে লাগল। মিছিলে মিছিলে কাঁপতে লাগল রাজপথ।

'জেলের তালা ভাঙব
শেখ মুজিবকে আনব।'
'এগারো দফা, ছয় দফা।'
'তোমার নেতা আমার নেতা
শেখ মুজিব শেখ মুজিব।'
'জেগেছে জেগেছে, বাঙালি জেগেছে।'
'তোমার আমার ঠিকানা
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা।'

কঠোর হাতে আন্দোলন দমন করতে চাইল পাকিস্তান সরকার। পুলিশের গুলিতে প্রতিদিনই মানুষ মরছে। প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের মুখে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলো শাসকগোষ্ঠী। ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। শেখ মুজিবের মুক্তির পর উল্লাসে ফেটে পড়ল সাধারণ মানুষ। জয়ধ্বনি হতে লাগল এখানে সেখানে—'জয় বাংলা', 'জেলের তালা ভেঙেছি, শেখ মুজিবকে এনেছি।'

পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসভায় সম্বর্ধনা দেয়া হলো শেখ মুজিবকে। ২০ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেয়া হলো তাঁকে।

হাজার বছরের ঐতিহ্যময় জাতি বাঙালি। কিন্তু তাদের ছিল না কোনো রাষ্ট্র। অনেক দিন স্বাধিকারের দাবিতে সংগ্রাম করেছিল। যোগ্য নেতার অভাবে কখনো ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। শেখ মুজিব হয়ে উঠলেন বাঙালি জাতির যোগ্য নেতা। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এক বিন্দুতে নিয়ে এলো সকল

পেশার, সকল ধর্মের, সকল বর্ণের, সকল মতের বাঙালিকে। আর ওই একক বিন্দুর জায়গাটাই হলো স্বাধীনতা। বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনের জায়গায় এসে আর কোনো আপোস করলেন না শেখ মুজিব। মুক্তির পর রাওয়ালপিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবকে আমন্ত্রণ জানান আইয়ুব খান। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু শেখ মুজিব সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বরং দেশে একটি অবাধ নির্বাচনের দাবি জানান। গোলটেবিল বৈঠক ছলনামাত্র। শেখ মুজিবকে টোপ দিয়ে দেখল পাকিস্তানিরা। শেখ মুজিব সে টোপ গিললেন না। টোপ না গেলায় শেখ মুজিবের উপর আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল পাকিস্তানিরা। এবার ষড়যন্ত্রের নতুন জাল বুনল তারা। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা দিয়ে সরে গেলেন আইয়ুব খান। আবার সারা দেশে সামরিক শাসন জারি হলো। তবে বাঙালিদের আন্দোলনে পিছু হটলেন ইয়াহিয়া। ১৯৭০ সালের অক্টোবরে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণাও দিলেন। পরে সে নির্বাচনের তারিখ নিয়ে শুরু হলো টালবাহানা। শেষপর্যন্ত নতুন তারিখ ঘোষণা করা হলো ডিসেম্বরের সাত তারিখ। তার আগে ১২ নভেম্বর দেশের ইতিহাসে ঘটে যায় সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে হানা দেয় জলোচ্ছ্বাস। প্রাণ হারায় ১০ লাখ মানুষ। বাঙালিদের এই দুর্দিনে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ছিল নীরব। বিশ্বের নানা দেশ এগিয়ে এলেও পাকিস্তানিরা কোনো সহায়তাই দিল না। দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করলেন শেখ মুজিব। ২৬ নভেম্বর সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন। বললেন, 'ইসলামাবাদে প্রাসাদোপম অট্টালিকার জন্য ২০০ কোটি টাকা ব্যয় হতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশে ঘূর্ণিবাত্যা থেকে স্থায়ী আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ২০ কোটি টাকার বেলায় অর্থাভাবের নজির দেখানো হয়। বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি পরিকল্পনাও তৈরি হয় না বাংলাদেশে। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে মঙ্গলা ও তারবেলা বাঁধ নির্মাণের জন্য এক কোটি ডলারের বেশি খরচ হতে পারে।'

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের ৭ তারিখ দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হলো। দেশের মানুষ উপযুক্ত জবাব দিল। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেল ১৬৭টি। এবং প্রাদেশিক বিধানসভায় পূর্ব পাকিস্তানের ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেল

২৮৮টি। পুরো পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল আওয়ামী লীগ। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে লাখ লাখ মানুষের সামনে নির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ করালেন বঙ্গবন্ধু।

ওদিকে আরেক ষড়যন্ত্র শুরু হলো পশ্চিম পাকিস্তানে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে গড়িমসি করতে শুরু করলেন ইয়াহিয়া। বসে ছিলেন না জুলফিকার আলী ভুট্টোও। পশ্চিমা পুঁজিপতিদের সঙ্গে গোপন ফন্দি আঁটতে লাগলেন। ২৭ জানুয়ারি ঢাকায় পিপলস পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে বৈঠক শুরু হলো। ছয়দফার ব্যাপারে অটল রইলেন বঙ্গবন্ধু। আরো ভীত হয়ে বিদায় নিলেন ভুট্টো। ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের জন্য ইয়াহিয়াকে অনুরোধ জানালেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর কথা না শুনে ইয়াহিয়া ভুট্টো সাহেবের কথামতো ৩ মার্চ অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করলেন। বঙ্গবন্ধু সেটাও মেনে নিলেন। কিন্তু ১ মার্চ হঠাৎ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করলেন ইয়াহিয়া।

জনগণ রাস্তায় নেমে এলো। পাকিস্তানের জাতীয় পতাকায় আগুন ধরিয়ে দিল জনতা। স্লোগান উঠল—

‘ভুট্টোর মুখে লাথি মারো,
বাংলাদেশ স্বাধীন করো।’
‘বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো
বাংলাদেশ স্বাধীন করো।’
‘জাগো জাগো, বাঙালি জাগো।’

একটার পর একটা মিছিল আসতে শুরু করল বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে। বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী সিদ্ধান্ত শোনার অপেক্ষায় সবাই। বঙ্গবন্ধু কিন্তু তখন ছিলেন অচঞ্চল। ভীষণ ধীর স্থির। শান্ত। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মুক্তিসংগ্রামের দিনগুলো সামনে। এসময় তাঁর প্রতিটা সিদ্ধান্ত হতে হবে নির্ভুল। কারণ তাঁর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে আছে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির ভবিষ্যৎ। তাদের জীবন-মরণ। ২ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিলেন বঙ্গবন্ধু। আর সাত মার্চ রেসকোর্সের ময়দানে নতুন দিক নির্দেশনা দেবেন বলে জানালেন।

ওদিকে আন্দোলন দমানের চেষ্টা করেই যাচ্ছিল পাকিস্তানিরা। গুলি চালাল নিরস্ত্র বাঙালির উপর। তবু বাঙালিকে দমিয়ে রাখা গেল না। দিন দিন আন্দোলন চাঙ্গা হতে লাগল। জনতার দাবির কাছে নতি স্বীকার করে ১০ মার্চ ঢাকায় গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান জানালেন ইয়াহিয়া খান এবং ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকলেন। আর কুখ্যাত টিক্কা খানকে বাংলার গভর্নর করে পাঠালেন।

সাত মার্চ। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য রেসকোর্স ময়দানে লাখ লাখ মানুষ এসে হাজির। ১৮ মিনিটের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না।' 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।' তারপর সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিলেন এদেশের মানুষ। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ সত্ত্বেও কাজে গেলেন না বাঙালি সরকারি কর্মীরা। স্কুল-কলেজে ক্লাস হলো না। বেসামরিক প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের লোকেরাও বঙ্গবন্ধুর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই দেশের মানুষ চলতে লাগলেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের বড় বড় নেতা এগিয়ে এলেন। রাজনৈতিক সংকট এড়ানোর জন্য বৈঠক করতে লাগল শেখ মুজিবের সঙ্গে। ইয়াহিয়া নিলেন ছলনার আশ্রয়। ১৬ মার্চ ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। এরপর ভুট্টো এসে যোগ দিলেন সে আলোচনায়। আসলে আলোচনার নামে সময় নিচ্ছিল পাকিস্তানিরা। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অস্ত্র আর সৈন্য আনার কাজ চলছিল গোপনে। বাংলাদেশের সহজসরল মানুষ পাকিস্তানিদের এই ছলনা বুঝতে পারেনি।

২৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন হলো ঘরে ঘরে। ২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তানের জাতীয় দিবস। কিন্তু বাংলাদেশের কোথাও পাকিস্তানের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। ওদিকে ইয়াহিয়ার লোকজন এই বলে প্রচার শুরু করল, আলাপ-আলোচনা সফল হতে যাচ্ছে।

এরপর এলো ২৫ মার্চ ১৯৭১। সন্ধ্যায় নিজের বাসভবনে সংবাদ

সম্মেলন করেন বঙ্গবন্ধু। সামরিক বাহিনীর নির্যাতনের প্রতিবাদে ২৭ মার্চ পুরো দেশে হরতালের ডাক দেন। ঠিক তখনই সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় অত্যন্ত চুপিসারে নিজস্ব বিমানে ঢাকা ত্যাগ করেন ইয়াহিয়া।

এরপর রাত ১১টা ৩০ মিনিটে সৈন্যভর্তি ট্রাক আর ট্যাঙ্ক বেরিয়ে আসে ক্যান্টনমেন্ট থেকে। রাত ঠিক ১টায় শুরু হয় অপারেশন সার্চলাইট। এটা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কিত দিন। নিষ্ঠুরতম দিন। মানব-সভ্যতার লজ্জাজনক দিন। ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবের আলোচনা ফলপ্রসূ হচ্ছে। দেশের সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্ত হতে শুরু করেছে। রাতের অন্ধকারে টিক্কা খানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের সশস্ত্র সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘুমন্ত বাঙালিদের উপর। মেশিনগান, ট্যাঙ্ক, মর্টার, কামান, বন্দুক নিয়ে আক্রমণ চালাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস, সংবাদপত্র অফিস, ইপিআর ক্যাম্প, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—সবকিছুর উপর আক্রমণ চালাল। পথচারীসহ বিভিন্ন স্টেশনে অপেক্ষমাণ নিরীহ বাঙালিও রেহাই পেল না। সামনে যাকে পেল তাকেই গুলি করে মেরে ফেলল। ঢাকা শহর হয়ে গেল মৃত্যুপুরী।

বঙ্গবন্ধুকে তার বাসা থেকে তুলে ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে আসা হয়। তিনদিন পর গোপনে নিয়ে যাওয়া হয় করাচি। তবে গ্রেফতারের ঠিক আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। গোপন ওয়ারলেস বার্তায় বঙ্গবন্ধু বলেন, 'পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। ছাত্র-জনতা-পুলিশ-ইপিআর শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়েছে। আমি ঘোষণা করছি আজ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। সর্বস্তরের নাগরিকদের আমি আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা যে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, যার যা আছে তাই নিয়ে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ না করা পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। সম্মিলিতভাবে শত্রুর মোকাবিলা করুন। এই হয়তো আপনাদের প্রতি আমার শেষ বাণী হতে পারে। আপনারা শেষ শত্রুটি দেশ থেকে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যান।'

পিলখানায় ইপিআর ব্যারাক ও অন্যান্য জায়গা থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার লিখিত বাণী ওয়ারলেসের মাধ্যমে সারা দেশে মেসেজ

আকারে পাঠানো হয়। চট্টগ্রাম ইপিআর সদর দফতরে পৌঁছায় বার্তাটি। চট্টগ্রাম উপকূলে নোঙর করা একটি বিদেশি জাহাজও এই বার্তা গ্রহণ করে। ওই সময় চট্টগ্রামে অবস্থান করছিলেন আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জহুর আহমেদ চৌধুরী। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী সাইক্লোস্টাইল করে রাতেই শহরবাসীর মধ্যে বিলির ব্যবস্থা করেন তিনি।

২৬ মার্চ বেতার ভাষণ দেন ইয়াহিয়া খান। বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে অভিহিত করেন এবং এর জন্য চরম শাস্তি পেতে হবে বলেও জানান। সঙ্গে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করেন।

হঠাৎ আক্রমণে হকচকিয়ে গিয়েছিল বাংলার মানুষ। বাংলার মানুষের ঘুরে দাঁড়াতে বেশি সময় লাগেনি। বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্য, ইপিআর, পুলিশ, আনসার বিদ্রোহ ঘোষণা করল। প্রতিরোধ গড়ে তুলল বাংলার ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক-শ্রমিক সবাই। গ্রেফতার হওয়ার আগে আওয়ামী লীগের নেতাদের গ্রেফতার না হয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ভারতে চলে যান। ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার গঠন করেন তাঁরা। সরকারের নাম দেয়া হয় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপ্রধান ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান করে গঠিত হয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ।

সাধারণ নিরীহ মানুষের উপর অন্যায়-অত্যাচারের ফলাফল ভালো হলো না। সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে জড়িয়ে পড়লেন সাধারণ মানুষ। বাংলাদেশ থেকে এক কোটি মানুষ আশ্রয় নিলেন প্রতিবেশী দেশ ভারতে। দেশের সাধারণ মুক্তিকামী মানুষকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিল ভারত। দুর্দিনে বাংলাদেশের সহায়তায় ভারতের সঙ্গে এগিয়ে এলো সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন পাকিস্তানের পক্ষে সাফাই গাইল। লাভ হলো না। মুক্তিকামী বাঙালি জাতির সামনে টিকতে পারল না আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত প্রশিক্ষিত পাকিস্তানি বাহিনী। ১৬ ডিসেম্বর ৯৩ হাজার সেনাসহ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় পাকিস্তান বাহিনীপ্রধান নিয়াজী।

স্বাধীন হলো দেশ। বাঙালি পেল একটি স্বাধীন ভূখণ্ড। পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত দেশ। কিন্তু মনভরে আনন্দ উদযাপন করতে পারল না

বাঙালি। পারবে কী করে? স্বাধীনতা এনে দেয়া মানুষটাই যে নেই। কোথায় আছেন কেউ জানে না। পাকিস্তানে বন্দি আছেন এটা সবাই জানে। বেঁচে আছেন কি না সেটা কেউ বলতে পারছেন না। বন্দি করার পর বঙ্গবন্ধুকে লয়ালপুর কারাগারে নির্জন সেলে আটক করে রাখা হয়। ৩ আগস্ট পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য শুরু হয় বিচার। চার মাস বিচারের পর ৩ ডিসেম্বর মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় তাঁকে। তড়িঘড়ি করে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতেও চেয়েছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। কিন্তু আর্ন্তজাতিক চাপে এ রায় কার্যকর করতে পারেনি। রায় কার্যকর করার জন্য সেলের পাশে বঙ্গবন্ধুর চোখের সামনে তাঁর কবরও খুঁড়ে রেখেছিল তারা। এর মাঝেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়। ইয়াহিয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রেসিডেন্ট হন জুলফিকার আলী ভুট্টো। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়ার জন্য বিক্ষোভ হতে থাকে। ততদিনে স্বাধীন হয়ে যায় বাংলাদেশ। স্বাধীন হওয়ার পর লয়ালপুর থেকে মিয়ানওয়ালী জেলে স্থানান্তর করা হয় বঙ্গবন্ধুকে। ২৬ ডিসেম্বর তাঁকে নিয়ে আসা হয় রাওয়ালপিন্ডির অতিথি ভবনে। এরপর ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়।

ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় ভুট্টোকে বলেছিলেন ইয়াহিয়া, 'শেখ মুজিবকে হত্যা না করে বিরাট ভুল করেছি। হয় তাকে হত্যা করার জন্য আমাকে সময় দাও, না হয় তুমি আমাকে কথা দাও, তুমি তাকে হত্যা করবে।'

মুক্তি দেয়ার পর ভুট্টো তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন পাকিস্তান ও বাংলাদেশ মিলে ফেডারেশন করার জন্য। রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারা। অসহায় নারীদের উপর অমানবিক নির্যাতন করেছিল তারা। তাদের সঙ্গে ফেডারেশন? ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। মুক্তির পর ওই দিনই বিশেষ বিমানে করে লন্ডনে যান বঙ্গবন্ধু। সেখানে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিথ ও বিরোধী নেতা উইলসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারপর ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানে দিল্লি আসেন ৯ জানুয়ারি। বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে স্বাগত জানান। এরপর ১০ জানুয়ারি ঢাকা আসেন বঙ্গবন্ধু।

বিমানবন্দর থেকে সরাসরি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসেন তিনি। পরাধীন জাতির নেতা হিসেবে যেখান থেকে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, স্বাধীন জাতির নেতা হিসেবে সেখানে এলেন বঙ্গবন্ধু। সেই রেসকোর্স সেদিনও লোকে লোকারণ্য ছিল। স্বাধীনতাসংগ্রামে নিহত লাখ লাখ শহীদের জন্য আবেগ-আপ্লুত হয়ে পড়লেন। উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বক্তৃতা করার সময় বার বার তাঁর গলা কেঁপে উঠছিল। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমার জীবনের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন। ইয়াহিয়ার কারাগারে আমি মরতে প্রস্তুত ছিলাম। কারণ আমি জানতাম আমার বাংলার মানুষ মুক্ত হবেই। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দেশকে স্বাধীনতার জন্য এত অল্প সময়ে এত প্রাণ দিতে হয়নি। আমি জানতাম তারা আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তাদের কাছে আমার একটাই প্রার্থনা ছিল—তোমরা আমার মৃতদেহটি আমার সোনার বাংলায় পাঠিয়ে দিও।'

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু। ১২ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী হন নতুন রাষ্ট্রপতি।

দেশ গড়ায় মনোনিবেশ করলেন বঙ্গবন্ধু। হাজারো সমস্যা দেশে। দোকানপাট, বাড়িঘর, শস্যভাণ্ডার সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে গেছে পাকিস্তানি সেনারা। রাস্তাঘাট, যানবাহন কিছুই নেই বলতে গেলে। পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিরা দেশ থেকে সব সম্পদ লুটেপুটে নিয়ে গেছে। ধ্বংস হয়ে গেছে কলকারখানা। দেশের অর্থনীতি একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আইনশৃঙ্খলারও বড্ড অভাব। অনেক পুলিশ ও আনসার সদস্য নিহত হয়েছেন। বাকিরা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেশের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়েছে। অনেক অস্ত্র চোর-ডাকাতের হাতে চলে গেছে। তাদের উৎপাতে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ। ভারত থেকে এক কোটি শরণার্থী ফিরে এসেছে। তাদের থাকার জায়গা নেই। খাবার নেই। ওদিকে পাঁচ লাখ বাঙালি পাকিস্তানে আটক। তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য বঙ্গবন্ধুকে চাপ দিচ্ছে তাদের আত্মীয়-পরিজন।

এত সমস্যার মধ্যে ঘাবড়ালেন না বঙ্গবন্ধু। তাঁর মনোবল ছিল অসীম। জনগণই তাঁর শক্তির উৎস। জনগণকে নিয়েই তাঁর সবকিছু।

নতুন সংগ্রামের ডাক দিলেন বঙ্গবন্ধু—এবারের সংগ্রাম দেশ গড়ার সংগ্রাম।

জমিতে চাষাবাদ শুরু হলো। কারখানায় উৎপাদন শুরু হলো। অস্ত্র জমা দিতে শুরু করল অনেকে। এর মধ্যেই আরেকটা সফলতা এলো। মাত্র তিন মাসের মধ্যে ফিরে গেল মিত্রবাহিনী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই করেছিল ভারতীয় বাহিনী। ১২ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে বিদায়ী সালাম জানিয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করল তারা। তিন মাসের মধ্যে এরকম দখল ছেড়ে যাওয়ার নজির বিশ্ব ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই।

কিন্তু সহায় হলো না প্রকৃতি। পরপর দুবছর ফসল উৎপাদন হয়নি। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও যুদ্ধে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিল। দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও হাহাকার শুরু হয়ে গেল। বিদেশি সাহায্য চাইলেন বঙ্গবন্ধু। সহায়তার হাত বাড়াল ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। সমস্যার প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিলেন শেখ মুজিব। দেশের ভারী শিল্পকারখানা, ব্যাংক-বিমা প্রভৃতি জাতীয়করণ করলেন। ৪ নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হলো। মূলনীতি ছিল—বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

পরের বছর নতুন করে নির্বাচন দেয়া হলো। নির্বাচনে জয়ী হয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও প্রণয়ন করলেন। বিশ্বের সকল শান্তিকামী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলেন। আর প্রথম বাঙালি হিসেবে বিশ্বশান্তিতে অবদানের জন্য জুলিওকুরি পদকে ভূষিত হলেন বঙ্গবন্ধু।

ওই বছরই আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগ দিলেন বঙ্গবন্ধু। ওখানে বক্তৃতায় বললেন, 'পৃথিবী আজ দুইভাবে বিভক্ত—শোষক ও শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।'

তাঁর বক্তৃতা শুনে কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ত্রো অভিনন্দন জানালেন। বললেন, 'আজ থেকে একটি বুলেট অহরহ তোমার পিছু নেবে।'

পরের বছর ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ। জাতিসংঘে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু। তবে বছরটা ছিল বাংলাদেশের জন্য এক দুঃসময়। যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক

ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ হানা দেয়। প্রথমে হয় খরা। পুড়ে যায় ফসল। এরপর হলো বন্যা। ১৯টির মধ্যে ১৭টি জেলা বন্যায় তলিয়ে যায়। ভেঙে পড়ে কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। একই সময়ে বিশ্ববাজারেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তেলের দাম বেড়ে যায় হু হু করে। দেশে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০ লক্ষ টন। দেশের টাকায় কেনা গম বোঝাই জাহাজ এলো না আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কারণে। দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। না খেতে পেয়ে মারা গেল ৩০ হাজার মানুষ। সুযোগ পেয়ে গেল দেশের স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তিগুলো। মাথাচাড়া দিয়ে উঠল তারা। চোরাকারবারি, মুনাফাখোর, কালোবাজারি, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বেড়ে গেল। লুটপাট হতে লাগল নানান জায়গায়। দেশের ভিতরে ও বাইরের চক্রান্তের কারণে ৩১ ডিসেম্বর জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু। কঠোর হাতে শত্রুদের দমন করেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা চালু করেন। রাষ্ট্রপতি হলেন বঙ্গবন্ধু। সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি ও মনসুর আলী প্রধানমন্ত্রী। ২৪ ফেব্রুয়ারি সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ নামে সর্বদলীয় মঞ্চ গঠনের ডিক্রি জারি করলেন। এর লক্ষ্য ছিল জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে দেশগঠন। ৭ জুন বঙ্গবন্ধুকে চেয়ারম্যান করে বাকশালের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঘোষণা করা হলো। বাকশালকে দ্বিতীয় বিপ্লব বলে আখ্যা দিলেন বঙ্গবন্ধু। প্রশাসনকে গণমুখী করার জন্য সকল মহকুমাকে জেলায় পরিণত করলেন। প্রতি জেলায় একজন করে গভর্নর নিযুক্ত করলেন। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন গভর্নর। জেলার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি জনগণের নিকট দায়ী থাকবেন।

গভর্নরদের জন্য নতুন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করলেন বঙ্গবন্ধু। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'সচিবালয় বা গণভবনের মধ্যে আমি শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা রাখতে চাই না। আমি আস্তে আস্তে গ্রামে, থানায়, ইউনিয়নে, জেলা পর্যায়ে এটা পৌঁছে দিতে চাই। যাতে জনগণ সরাসরি এসবের সুযোগ-সুবিধা পায়।'

ব্যাপক সাড়া পড়ে গেল। দলে দলে মানুষ বাকশালে যোগ দেয়ার জন্য আবেদন করতে লাগল। সাধারণ মানুষ উদ্বুদ্ধ হলো। খুশি হলো।

কিন্তু দেশের ভিতরেই রয়ে গেল পাকিস্তানি ভাবধারার কিছু শোষক। ছদ্মবেশে তারা নানান অপকর্ম করছিল। নানান ভাবে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কারণে সুবিধা করতে পারছিল না। এরাই ছিল স্বাধীনতার শত্রু। দেশপ্রেমিকের ভান ধরে লুকিয়ে ছিল। স্বার্থপর মানুষদের লোভ দেখিয়ে দল ভারী করল তারা। এর নির্মম ফল ভোগ করতে হলো বঙ্গবন্ধুকে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। তখনও সূর্য ওঠেনি। নগরবাসী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সারা দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে ঘুমিয়ে ছিলেন বঙ্গবন্ধুও। তখনই ট্যাঙ্ক নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে এগিয়ে যায় একদল ঘাতক। কর্নেল খোন্দকার ফারুক রহমান ও কর্নেল আবদুর রশীদের নেতৃত্বে সেনবাহিনীর কয়েকজন বিপথগামী সেনা আক্রমণ করে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি। প্রথমেই তারা গুলি করে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর দুই পুত্র শেখ কামাল ও শেখ জামালকে। গোলাগুলির শব্দে ঘুম ভেঙে যায় বঙ্গবন্ধুর। নিজের ঘর থেকে সিঁড়িতে আসেন। অস্ত্র হাতে এক ঘাতককে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। বঙ্গবন্ধুর বিশাল ব্যক্তিত্বের কারণে থমকে যায় ঘাতক। এরপর এগিয়ে আসে অন্য এক ঘাতক। বঙ্গবন্ধুকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই গুলি করতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর নিথর দেহ পড়ে থাকে সিঁড়ির উপর। স্বাধীন দেশের স্থপতিকে ডিঙিয়ে ঘাতকের দল এরপর একে একে হত্য করে বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেসা, দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামালকে। বঙ্গবন্ধুর আট বছর বয়সের শিশু রাসেলকেও রেহাই দেয়নি ঘাতকরা। আসবাবপত্রের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল শিশু রাসেল। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'আমি কোনো দোষ করি নাই। আমাকে মেরো না।'

ঘাতকদের হৃদয় গলল না। খুব কাছে থেকে গুলি করে হত্যা করল রাসেলকে। বঙ্গবন্ধুর ছোটভাই শেখ নাসের আশ্রয় নিয়েছিলেন বাথরুমে। তাঁকে সেখানেই হত্যা করা হয়। জার্মানিতে থাকায় বেঁচে গেলেন বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হসিনা ও শেখ রেহানা।

এরপর ঘাতকের দল বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি ও ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়িতে আক্রমণ চালায়। সপরিবারে হত্যা করে তাঁদের।

এরপর খুলে যায় ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ। রাষ্ট্রক্ষমতায় বসল বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ দিনের সহচর খোন্দকার মোশতাক আহমদ। এখানেই শেষ হয়নি তাদের ষড়যন্ত্র। ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর এক অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়—১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতদের বিচার করা যাবে না।

বঙ্গবন্ধুকে বড্ড অবহেলায় কবর দেয়া হয় তাঁর জন্মস্থানে। এখনও তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন টুঙ্গিপাড়ায়। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে চিরতরে দেশের মানুষের হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল স্বার্থান্বেষীরা। কিন্তু বাঙালি যতদিন স্বাধীন থাকবে, যতদিন বাংলাদেশ থাকবে—তাঁর অবদান অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু চিরদিন থাকবেন বাঙালির হৃদয় জুড়ে।

শেখ মুজিবুর রহমান
(১৯২০ থেকে ১৯৭৫)

১৯২০

জন্ম ১৭ মার্চ। গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। বাবা শেখ লুৎফর রহমান। মা সায়েরা খাতুন।

১৯২৭

শেখ মুজিবের বয়স তখন সাত বছর। তাঁকে ভর্তি করানো হলো গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

১৯২৯

বাবা চাকরি করতেন গোপালগঞ্জে। নয় বছর বয়সে মুজিবকে নিজের কাছে নিয়ে রাখলেন বাবা। তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দিলেন গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে।

১৯৩৪

বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হলেন মুজিব। চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হলো তাঁকে। জীবনে প্রথমবার কলকাতায় গেলেন মুজিব।

১৯৩৬

গোপালগঞ্জ থেকে বদলি হয়ে মাদারীপুর আসেন শেখ লুৎফর রহমান। বাবার সঙ্গে শেখ মুজিবও মাদারীপুর এলেন। ভর্তি হলেন মাদারীপুর হাইস্কুলে। আবারও সপ্তম শ্রেণিতে। আবার চোখের ব্যামো। এবার ধরা পড়ল গ্লুকোমা। আবারও তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো কলকাতায়। অপারেশনের পর সুস্থ হলেন।

১৯৩৭

অসুস্থতার জন্য টানা কয়েকবছর লেখাপড়া বন্ধ ছিল তাঁর। আবার বদলি হয়ে বাবা এলেন গোপালগঞ্জ। শেখ মুজিব ভর্তি হলেন গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে।

১৯৩৮

মিশন স্কুল পরিদর্শনে আসেন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সখ্য তৈরি হলো মুজিবের। এ বছরই প্রথমবারের মতো কারাবরণ করেন শেখ মুজিব। জেল খেটেছেন সাত দিন।

১৯৪১

গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন এবং দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন। এরপর ভর্তি হন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে। থাকতেন ওই কলেজের বেকার হোস্টেলের ২৪ নম্বর কক্ষে।

১৯৪৩

ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয় বাংলায়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য কাজ করতে থাকেন শেখ মুজিব। দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ সম্মেলনে ডেলিগেট হিসেবে যোগ দেন।

১৯৪৪

মিল্লাত পত্রিকা প্রকাশ হলে শেখ মুজিব সেখানে স্বেচ্ছাশ্রম দিতেন।

১৯৪৫

মুসলিম লীগের নির্বাচনী অফিস ও কর্মশিবির খোলার জন্য ফরিদপুর আসেন।

১৯৪৬

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে দিল্লিতে মুসলিম লীগের কনভেনশনে যোগ দেন। হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন।

১৯৪৭

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। দেশভাগের পর কলকাতা থেকে ঢাকায় আসেন। গঠন করেন গণতান্ত্রিক যুবলীগ।

১৯৪৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম

ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। কয়েকবার গ্রেফতার হন।

১৯৪৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ও ছাত্রদের ধর্মঘটে সক্রিয় অংশ নেন। এ অপরাধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে বহিষ্কার হন। আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কারাগারে থাকা অবস্থাতেই দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হন। মুক্তির পর রাজনীতিতে সক্রিয় হন। পুলিশ ও গোয়েন্দাদের ফাঁকি দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করে আসেন। দেশে আসার পর গ্রেফতার হন।

১৯৫০

মামলার রায়ে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয় তাঁর। জেলখানায় সুতাকাটার কাজ করেন।

১৯৫১

দীর্ঘসময় কারাগারে থাকার পর মুক্তি পান। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যের চরম অবনতি হয়।

১৯৫২

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় জেলে বন্দি ছিলেন। ফরিদপুর জেলে বদলি করা হয় তাঁকে। আমরণ অনশন শুরু করেন। টিউব দিয়ে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করায় আরো অসুস্থ হয়ে পড়েন মুজিব।

২৮ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাওয়ার পর আওয়ামী মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হন। করাচি গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। করাচিতে সংবাদ সম্মেলনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিসহ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন দাবির ব্যাখ্যা করেন। বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে পিকিং যান। বছর শেষে সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে বাংলাদেশের জেলায় জেলায় জনসভা করেন।

১৯৫৩

আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভায় সভাপতি হিসেবে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও সম্পাদক হিসেবে শেখ মুজিব নির্বাচিত হন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনের জন্য সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল হক ও ভাসানীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। দেশব্যাপী নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন।

১৯৫৪

গোপালগঞ্জ থেকে বিপুল ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। যুক্তফ্রন্ট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ২২৮টি আসন পায়। এই ২২৮টি আসনের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ পায় ১৪৩টি আসন।

১৯৫৪

মে মাসে গঠিত পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভায় মাত্র ৩৪ বছর বয়সে সমবায় ও কৃষি উন্নয়ন মন্ত্রী হন শেখ মুজিব। তবে পশ্চিম পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের কারণে বেশিদিন যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। গ্রেফতার হন শেখ মুজিব। আরো কিছু মামলা হয় তাঁর নামে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী হন। মুক্তি পেয়ে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান মুজিব।

১৯৫৫

পাকিস্তান গণপরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে নির্বাচিত হন শেখ মুজিব। ঢাকায় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে সংগঠনের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু আওয়ামী লীগ করা হয়। পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতিবাদে এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। আবারও মওলানা ভাসানী সভাপতি ও শেখ মুজিব সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৬

শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ভুখা মিছিলে চকবাজারে গুলি চালায় পুলিশ। তিনজন নিহত। আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও পল্লীউন্নয়ন মন্ত্রী হন শেখ মুজিব।

১৯৫৭

আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে নতুন রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করে ভাসানী। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পুনর্গঠনের জন্য মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন মুজিব। চীন সফরে মাও সেতুং ও চৌ-এন-লাইয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন।

১৯৫৮

পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন ইস্কান্দার মির্জা। আইয়ুব খান হন

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। ভাসানী, মুজিবসহ পূর্ব পাকিস্তানের অনেক নেতা গ্রেফতার হন। ইস্কান্দার মীর্জাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে ক্ষমতা দখল করেন আইয়ুব খান।

১৯৫৯

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মামলা হয়। ১০ ডিসেম্বর মুক্তি দিয়ে আবার জেল গেট থেকে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। মৌলিক গণতন্ত্রের ঘোষণা দেন আইয়ুব খান।

১৯৬৩

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দেখতে লন্ডন যান মুজিব। ডিসেম্বরে লেবাননের রাজধানী বৈরুতে রহস্যজনক মৃত্যুবরণ করেন সোহরাওয়ার্দী।

১৯৬৪

খুলনা ও ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়। উদ্বাস্তু বিহারিরা হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালায়। দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেন মুজিব। আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবনের সিদ্ধান্ত নেন। পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ থেকে আইয়ুব খান ও বিরোধীদল থেকে ফাতেমা জিন্নাহ প্রার্থী হন। করাচিতে ফাতেমা জিন্নাহর সঙ্গে বৈঠক করেন শেখ মুজিব।

১৯৬৫

মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন আইয়ুব খান। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করা হয়। সেপ্টেম্বরে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলে ১৭ দিন। এসময় একেবারেই অরক্ষিত ছিল পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান অরক্ষিত রাখার তীব্র সমালোচনা করেন শেখ মুজিব।

১৯৬৬

দুই বছরের কারাদণ্ড হয় মুজিবের। হাইকোর্টে জামিন লাভ করেন। লাহোরে বিরোধীদলীয় সম্মেলনে আওয়ামী লীগ থেকে যোগ দেন শেখ মুজিব। আরো ছিলেন মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগিশ, তাজউদ্দীনসহ দশ নেতা। ১০ ফেব্রুয়ারি এই জাতীয় সম্মেলনে ছয় দফা উত্থাপন করেন মুজিব।

ছয় দফার পক্ষে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায় পূর্ব পাকিস্তানে। আওয়ামী

লীগের কাউন্সিলে ছয় দফাকে আওয়ামী লীগের মূল কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে সভাপতি ও তাজউদ্দীন আহমদকে সাধারণ সম্পাদক করে আওয়ামী লীগের নতুন নেতৃত্ব ঘোষণা করা হয়।

১৯৬৮

শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি ও ৩৫ জন সামরিক-বেসামরিক নাগরিককে অভিযুক্ত করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। বিচার শুরু হয় বিশেষ ট্রাইব্যুনালে।

১৯৬৯

ডাকসু সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এ পরিষদ থেকে ১১ দফা ঘোষণা করা হয়। জানুয়ারির ২০ তারিখ আসাদ ও ২৪ তারিখ পুলিশের গুলিতে মতিয়ুর নিহত হন। আন্দোলন রূপান্তরিত হয় গণঅভ্যুত্থানে। ২৫ জানুয়ারি থেকে ঢাকায় কারফিউ জারি করে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। শেখ মুজিবের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সারা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। অনিবার্য পতনের মুখে পড়ে যান আইয়ুব খান। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান করেন আইয়ুব। শেখ মুজিবকে বন্দি রেখে বৈঠকে যোগদানে অস্বীকৃতি জানায় আওয়ামী লীগ। প্যারোলে মুক্তি নিয়ে বৈঠকে যোগ দিতে রাজি হননি শেখ মুজিবও। ২০ ফেব্রুয়ারি কারফিউ প্রত্যাহার করে সরকার। ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সকল বন্দিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় সরকার।

২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে দশ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ। ১০ থেকে ১৩ মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক হয়। বৈঠকে ছয় ও এগার দফার ভিত্তিতে সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সরকার গঠন, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও বৈষম্য দূরীকরণের দাবি জানান শেখ মুজিব। কিন্তু তাঁর সকল দাবি অগ্রাহ্য হয়। ২৫ মার্চ পদত্যাগ করেন আইয়ুব খান। সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতায় আসেন সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খান।

১৯৭০

জুনে ঢাকায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। দুই পাকিস্তানের

উভয় কমিটির সভাপতি হলেন বঙ্গবন্ধু। রেসকোর্সের জনসভায় 'জয়বাংলা' স্লোগান দিয়ে ভাষণ শেষ করলেন শেখ মুজিব। নির্বাচনী প্রচারণার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে দশ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। ডিসেম্বরের নির্বাচনে নৌকা প্রতীক নিয়ে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে ১৬২ আসনে। আর প্রাদেশিক পরিষদে ২৯৮ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ২৮৮ আসন।

১৯৭১

৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানান জুলফিকার আলী ভুট্টো। ১ মার্চ বেতার ভাষণে অধিবেশন মুলতবি করেন ইয়াহিয়া খান। বঙ্গবন্ধুর ডাকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন মুজিব। বললেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। ১৬ মার্চ ঢাকায় ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা শুরু হলো। ২১ মার্চ পর্যন্ত ৫ বার বৈঠক হয়। ২২ মার্চ আলোচনায় অংশ নিতে আসেন ভুট্টো। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় বৈঠক অসমাপ্ত রেখে গোপনে ঢাকা ছাড়েন ইয়াহিয়া। মাঝরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরিকল্পিত গণহত্যা শুরু করে। মৃত ও ধ্বংসের নগরীতে পরিণত হয় ঢাকা। রাত ১২টা ২০ মিনিটে অর্থাৎ ২৬ মার্চের শুরুতেই ওয়ারলেস ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন'। চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

রাত ১টার কিছু পরে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে তিন দিন আটকে রাখে ঢাকায়। পরে বিমানে করে নিয়ে যাওয়া হয় করাচিতে। ২৬ মার্চ বেতার ভাষণে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চরম শাস্তিদান ও আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন ইয়াহিয়া খান।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপ্রধান করে গঠন করা হয় বাংলাদেশ সরকার।

মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে ভারত। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে চীন বাদে সকল সমাজতান্ত্রিক দেশ সমর্থন জানায় বাংলাদেশকে।

লয়ালপুর কারাগারে নির্জন সেলে আটক রাখা হয় বঙ্গবন্ধুকে। ৩ আগস্ট পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য শেখ মুজিবের বিচার শুরু হয়। চার মাস বিচারের পর ৩ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। যদিও নানান চাপে এ রায় কার্যকর করতে পারেনি পাকিস্তান সরকার।

২১ নভেম্বর বাংলাদেশের স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী সম্মিলিত অভিযান শুরু করে। এদিন ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ড গঠিত হয়।

পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানের মিত্ররা জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব এনে মুক্তিযুদ্ধ থামিয়ে দিতে চেয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দেয়ায় সেটা সম্ভব হয়নি। খোঁড়া অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠায়।

১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসর্মপণ করে। পৃথিবীর বুকে জায়গা করে নেয় নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুকে লয়ালপুর থেকে মিয়ানওয়ালী জেলে স্থানান্তর করা হয়। ২৬ ডিসেম্বর তাঁকে নিয়ে আসা হয় রাওয়ালপিন্ডির অতিথি ভবনে।

১৯৭২

৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়া হয়। এর মধ্যে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ মিলে ফেডারেশন করার প্রস্তাব করলে অসম্মতি জানান বঙ্গবন্ধু। ৮ জানুয়ারি বিশেষ বিমানে করে বঙ্গবন্ধু ও ড. কামাল হোসেন লন্ডনে যান। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিথ ও বিরোধী নেতা উইলসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানে দিল্লি আসেন ৯ জানুয়ারি। বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে স্বাগত জানান। ১০ জানুয়ারি ঢাকা আসেন বঙ্গবন্ধু। রেসকোর্সের জনসভায় যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

১২ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী হন নতুন রাষ্ট্রপতি। ১২ মার্চ বাংলাদেশ ত্যাগের আগে বঙ্গবন্ধুকে বিদায়ী সালাম জানায় মিত্রবাহিনী। ৩ মাসের মধ্যে দখল ছেড়ে যাওয়ার এমন নজির বিশ্বইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। ২৬ মার্চ ভারী শিল্পকারখানা, ব্যাংক-বিমা প্রভৃতি জাতীয়করণ করেন বঙ্গবন্ধু। মার্চে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন।

৪ নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়। মূলনীতি ছিল—বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

১৯৭৩

মার্চে নির্বাচনে জয়ী হয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন মুজিব। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। বিশ্বশান্তিতে অবদানের জন্য জুলিও কুরি পদকে ভূষিত হন।

১৯৭৪

ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় পাকিস্তান। লাহোরে ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন শেখ মুজিব। সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের অধিবেশনে বাংলায় ভাষণ দেন শেখ মুজিব। বিশ্বের ১২৬টি দেশ স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশকে।

দেশে ১৯টির মধ্যে ১৭টি জেলা বন্যায় ডুবে যায়। শস্য বিনষ্ট ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে চরম খাদ্যসংকট শুরু হয় দেশে।

১৯৭৫

২৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়। রাষ্ট্রপতি হন বঙ্গবন্ধু। সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি ও মনসুর আলী প্রধানমন্ত্রী হন। ২৪ ফেব্রুয়ারি সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে সর্বদলীয় মঞ্চ গঠনের ডিক্রি জারি করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে দেশগঠন করা। ৭ জুন বঙ্গবন্ধুকে চেয়ারম্যান করে বাকশালের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঘোষণা করা হয়।

১৫ আগস্ট প্রথম প্রহরে একদল বিপথগামী সেনা বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবনে হামলা চালায়। নির্মমভাবে হত্যা করে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকে।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন টুঙ্গিপাড়ায়। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু বাঙালি হৃদয় দখল করে আছেন চিরদিনের জন্য।

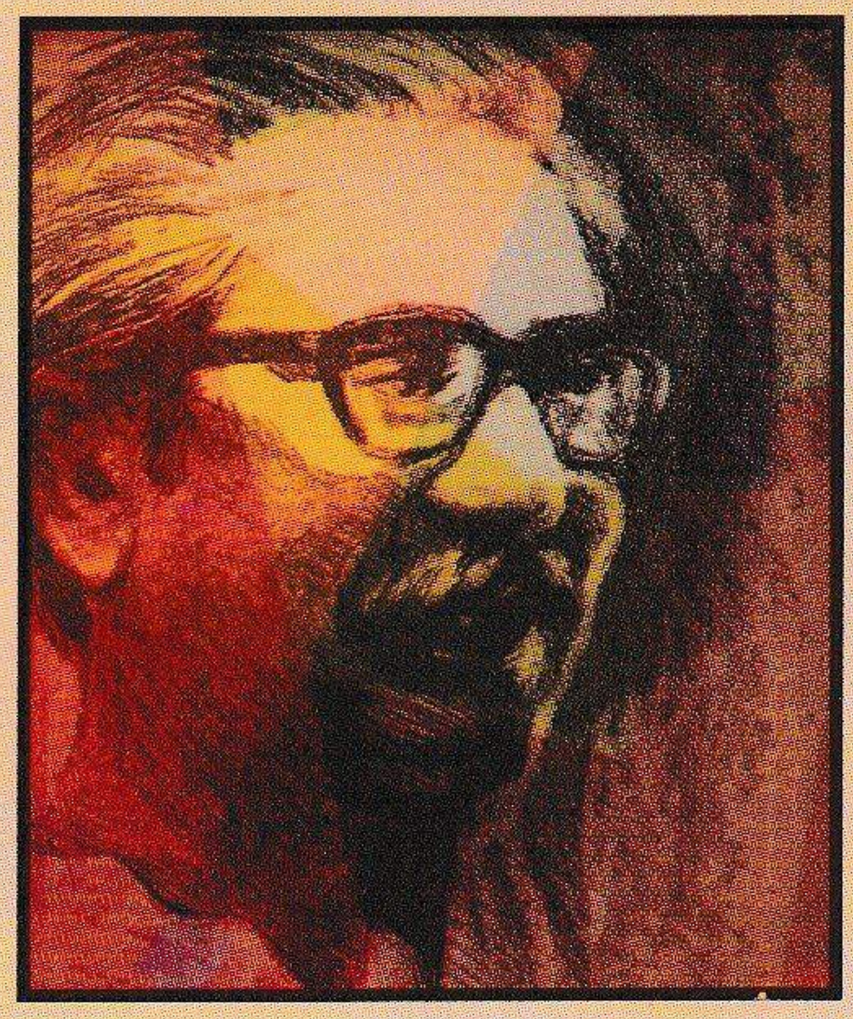

একটি ইত্যাদি প্রকাশনা